কাব্য-চিন্তা

কাব্য-চিন্তা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রণীত।

কলিকাতা ; ডন্ প্রেস।

১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।
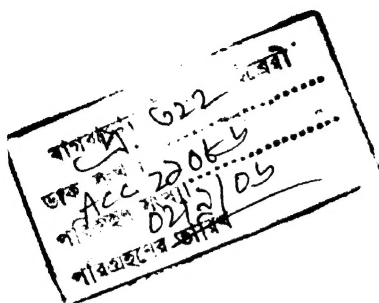
৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, ডন্ প্রেস হইতে

শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

এই গ্রন্থে যে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকটিত হইল, তাহা বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যদর্শন, নব্যভারত, বিভা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "সাহিত্য-চিন্তা"য় আমি রামায়ণ ও মহাভারতের সমালোচনা আরম্ভ করি, এ গ্রন্থেও তাহার আর এক অংশ পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশীয় পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনা এক্ষণে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমি এই সমালোচনা প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি। তদ্দ্বারা যদি সেই সাহিত্যের সমাদর কিয়ৎ পরিমাণেও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব। ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সমালোচনার আধিক্য থাকাতে ইউরোপীয় কাব্যাবলির এত সমাদর বাড়িয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে দিন দিন আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ যেমন প্রকটিত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচন-দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য, গূঢ় মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যাদি প্রকাশ করা কি একান্ত কর্ত্তব্য নহে? সেই কর্ত্তব্য-সাধনে আমার চেয়ে যাঁহাদের অধিকতর ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেই প্রকৃত সুফল ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইংরাজী যখন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী বিদ্যা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহা না শিখিলে নয়; কিন্তু তাহার বিষময় ফল নিবারণার্থ হিন্দুশাস্ত্রাদির সমালোচনা সঙ্গে সঙ্গে

করাই আবশ্যক। নহিলে সেই বিষ প্রবেশলাভ করিয়া যা
একবার আমাদের প্রবৃত্তি ও রুচিকে কলুষিত করিয়া দে
তখন আর সে প্রবৃত্তি ও রুচিকে পরিশুদ্ধ করিয়া আনা ব
সহজ কথা নয়। এই বিষময় ফল কি প্রকার, তাহা "সাহিত্য
চিন্তা"য় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণকার বঙ্গ
সাহিত্য মধ্যেও তমোগুণান্বিত ইংরাজীভাব ও ইংরাজী বিদ্যার
অহিন্দু রুচি অনেক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেই
সাহিত্যও যেমন বহুল পরিমাণে অধীত হইতেছে, তৎসঙ্গে
সঙ্গে সেই ভাব ও রুচি বঙ্গ সমাজের হাড়ে হাড়ে সংবিদ্ধ
হইতেছে। ক্রমে ক্রমে হিন্দুকে অহিন্দু করিয়া আনিতেছে।
ইংরাজী সাহিত্য-পাঠের যে ফল, এই প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থাধ্যয়-
নেরও সেই ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিষময় ফল নিবা-
রণের একমাত্র উপায় আমাদের স্বদেশীয় দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদির
সম্যক্ প্রচার ও আলোচনা। তাই বলি, আমাদের পৌরাণিক
সাহিত্যের সমাদর করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারত জয়শাস্ত্রের অন্তর্গত। জয়শাস্ত্রের
আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ধরিয়া তাহাদের কাব্যাংশ বিরচিত হইয়াছে।
সেই উদ্দেশ্য বিশদ করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর
কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এই দুই পুরাণ মধ্যে
যে ইতিহাস ও লোকচরিত্র আছে, তাহা তাহার প্রধান উদ্দেশ্যে-
রই সাধনোপযোগী উপকরণ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে ইতিহাস
বলিতে কি বুঝাইত এবং মহাভারত ও রামায়ণ সেই অর্থে
কিরূপ ইতিহাসের আদর্শ-স্থানীয়, আমি সেই কথাই ব্যক্ত
করিয়াছি। সুতরাং সেই পুরাণদ্বয়ের কাব্যভাগ বিবৃত করিতে

না। আমি তাহাদের ঐতিহাসিকত্বের অপলাপ করি নাই। বরং তাহাদের ঐতিহাসিকত্ব কোথায় ও কিরূপ, তাহাই খ্যাপন করিয়াছি। তাহারা যে এক প্রকার ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য, এই কথাই আমি বলিয়াছি। পঞ্চম বেদরূপে মহাভারত সাধারণ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার ঐতিহাসিক দেহাবরণ মধ্যে যে বেদার্থের আধ্যাত্মিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার টীকাকারগণও তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব, জয়শাস্ত্রের অধ্যাত্মবাদ আমার কথা নহে। আমার কথা কে গ্রাহ্য করিবে? শাস্ত্রে তাহার আধ্যাত্মিকতা বিবৃত হইয়াছে বলিয়া আমিও তদনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু তদনুসরণ করিয়া আমি এমত কথা বলি নাই যে, মহাভারত ইতিহাস ও লোকচরিত্র নহে। ঋষিগণ তাহাকে ইতিহাস বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। সুতরাং তাহা একাধারে ইতিহাস ও কাব্য। ঋষিগণ ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝিতেন, তাহা কাব্য-লক্ষণের সহিত অসমঞ্জসীভূত নহে। আমি সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছি। ইতিহাসবেত্তাগণ রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহাদের অপর দিক্ দেখাইয়াছি মাত্র। এক দিক দেখাইতে গেলে, অপর দিকের অপহ্নব করা হয় না।

বলা বাহুল্য, মহাভারত ও রামায়ণ যে রূপে কাব্য, অপরাপর পুরাণও তদ্রূপ কাব্য। আলঙ্কারিক বলেন, যাহা রসাত্মক বাক্য, তাহাই কাব্য। এ গ্রন্থে কাব্যের সেই লক্ষণ ও উপকরণ—তাহার রস, কল্পনা ও ছন্দাদির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থোক্ত কবিগণের প্রতিভাও বিবৃত করিয়াছি। প্রতিভা এবং কবিত্ব

বলিতে কি বুঝায়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্
কাব্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার অধ্যয়ন-
কিরূপ দেখিতে হইবে। যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত
হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কা
সুতরাং, যাহা রসাত্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যায়ন-ফল অ
যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে। যা
অধ্যয়ন-ফলে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় মুগ্ধ হয়, তাহা নি
কাব্য, কিন্তু যাহার রসে সমুদায় সমাজ-মুগ্ধ, তাহা অতি উ
কাব্য, বিলাতী সেক্সপিয়ারের ভাল ভাল ট্র্যাজিডি-দ্বারা সম
অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা কাব্য। তাহা
অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট। ইংরাজী স্বাধীন প্রেমঘটিত কাব্য
ও ট্র্যাজিডির অনুকরণে যে সকল কদর্য্য বাঙ্গালা উপন্য
কাব্য ও নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধ্যয়ন-ফলে আ
বঙ্গসমাজে তদনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা ও সাম্যভাব
আচার-ব্যবহারের অভিনয় এবং আত্মঘাতী ও পরঘাতী খু
দলের সৃষ্টি হইতেছে। এই সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থে সেক্সপিয়া
অতুলনীয় প্রতিভার সামগ্রী কিছুই নাই এবং অপরাপর ইংরা
কাব্য-নাটকের গুণভাগও নাই, কেবল তাহাদের দোষ-ভ
আছে মাত্র। এইরূপ সাহিত্য-পাঠে সমাজ হইতে শ্রদ্ধা, ভ
দয়া প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের গুণ সকল ক্রমশই তিরোহিত হইতে
এবং তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী স্বায়পরতা ও সাম্যভাবের বিলক্ষ
প্রাদুর্ভাব হইতেছে। সুতরাং অধুনাতন বিলাতী-রুচিসম্প
সাহিত্যের অধ্যয়ন-ফল অত্যন্ত গর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি
আমাদের পুরাণাদির রসোদ্দীপনা অতি উৎকৃষ্ট। এই পুরাণাদি

রসে সমুদায় বঙ্গসমাজ কেমন সাত্ত্বিক ভাবে প্রচালিত ও সংগঠিত হইয়াছে, বঙ্গসমাজে ব্যাস বাল্মীকির কাব্যশক্তির প্রভাব কেমন প্রভূত, তাহা দেখাইবার জন্য আমি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। সেই প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভারত-রামায়ণের সামাজিক ফল অতি উৎকৃষ্ট, এবং তজ্জন্য পুরাণ সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট রসের আধার বলিয়া কাব্য নামের কতদুর উপযুক্ত গ্রন্থ। জগতে এই পৌরাণিক সাহিত্যের মত আর কোন্ কাব্যরাজির ফল তত উৎকৃষ্ট? এই জন্য বলি, বিলাতী রুচি-সম্পন্ন অনেক কাব্যের ফল আসুরী সৃষ্টি এবং পুরাণাদির সামাজিক ফল দৈবী-সম্পৎ (গীতা-১৬অ)। একের ফল সাত্ত্বিক, অপরের ফল রজ ও তমোগুণান্বিত।

ব্যাস, বাল্মীকি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গ সমাজকে কেমন প্রচালিত করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া সর্ব্বশেষে তাঁহাদের পৌরাণিক কাব্য-মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সাধনা-পদ্ধতি কেমন নিহিত,—যে ধর্ম্মসাধনা বলে আর্য্যধামে মুনি-ঋষির সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই ধর্ম্মসাধনা-পদ্ধতি—হিন্দুর সেই সংযমপথ প্রদর্শন করিয়া আমি এই কাব্য-প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছি। চিন্তাসূত্র এইরূপে সূত্রিত বলিয়া আমার এই গ্রন্থের নাম "কাব্য-চিন্তা" হইয়াছে। যেখানে সেই চিন্তার সম্পূর্ণতা সাধন হইয়াছে, সেই খানে আসিয়া বলিয়াছি তাহা—সম্পূর্ণ।

কলিকাতা হেগোলকুঁড়িয়া।
১লা আশ্বিন, ১৩০৭। গ্রন্থকার।

সূচী

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	ছত্র
ধ্বান্তরিং	ধ্বান্তারিং	৭	৯
করায়	কর।	১৭	১২
বিস্তৃত	বিস্তীর্ণ	১৯	১৩
চাহে	চাহেন	২৩	১
প্রসারতা	প্রসার	৩৯	১৪
মোহাবণ	মোহাবরণ	৪১	১৭
ব্রাহ্মগণ	ব্রাহ্মণগণ	৬০	৭
দশাননা	দশাননে	৭৪	২০
বৈরনির্য্যাতন	বৈরনির্যাতন	৮৮	১৭
স্বতঃই	স্বতই	৯৩, ৯৪	২০, ১
সপ্ত	শত	১০৯,	৪
একোন সপ্তশত	শত শত	১০৯, ১১১	৭, ২
কিছুকাজের	কিছুকালের	৪২	৮
একটী একটী	এক একটী	১৫০	১৬
যাবদীয়	যাবতীয়	১৫১	১১,
ধরনী	শ্রীধর	১৬২	১৩
তদ্সঙ্গে	তৎসঙ্গে	১৬৯	৩
আসুরী	আসুর	১৭৩	৫
মোক্ষে	মোক্ষের	২০৯	১

(কাব্য-চিন্তা।)

কাব্য,——জগতে।

বাহ্য-জগতে।

এ জগৎ বিভাময়। যতকাল জগৎ, ততকাল বিভা। হিন্দু-
র্শনিক মতে জগৎসংসার যদি অনাদি হয়, বিভাও তবে অনাদি।
নাদি কাল হইতে বিভা জগতের লোচনস্বরূপ হইয়া দিঙ্মণ্ডল
ালোকিত করিতেছে। অনন্ত নারায়ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত
ইয়া, বিভারূপে অনন্ত জগৎ আলোকিত করিয়া আছেন। বিভা
াহার রূপ, বিভা তাঁহার ঐশ্বর্য্য, বিভা তাঁহার তেজ, বিভা
াহার মহিমা। আমরা বিভাকে নমস্কার করি।

পুঞ্জীকৃত বিভারাশি বিভাকর, অনন্ত বিভার অংশ মাত্র।
েই অংশুমালী যখন লোক-লোচনের অদৃশ্য হইতে থাকেন,
খন তিনি সন্ধ্যাদেবীকে সাজাইয়া যান। সন্ধ্যাদেবী তখন
নন্ত আকাশের অসীম-প্রসার বসন পাতিলে বিভাকর সে
সনাঞ্চলে সুবর্ণময় বিভারাশি ছড়াইয়া দেন। সন্ধ্যাদেবী সেই
শিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া অগ্রে একটী তারা গড়িয়া দেখেন,

কেমন দেখায়। সে তারার উজ্জ্বলতায়, সৌন্দর্য্যে ও স্নিগ্ধতায় দেবী মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই তারাকে শিরোভূষণ করিয়া তখন অগণ্য তারা গড়িয়া আপনার অনন্ত বসন ভূষিত করেন। স্ত্রীসুলভ ক্রীড়াকৌতুকিনী সন্ধ্যাদেবী সেই তারাবলিতে আকাশের অনন্ত প্রসারে কতই বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি গড়িতে থাকেন। কোন খানে সিংহ, কোন খানে মেষ, কোন খানে বৃষ, কোন খানে মিথুন, প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য জগৎকে ধ্বান্ত-রাশিতে পরিব্যাপ্ত করেন। মাঝে বিভার ছায়া-পথ সজ্জিত থাকে। তখন তিনি বিভাবরী নামে সেই তারা-খচিত ও ছায়াপথসজ্জিত বসন পরিয়া শোভিত হন। নিত্য নিত্য এই নূতন-সাজে-সজ্জিতা বিভাবরী-দেবী জগতের মনোহরণ করিতেছেন। সেই বিভাবরী-রচিত তারার কি রূপ! যদি তুমি বিভার সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে সেই তারাবলিকে দেখ। ঘোর তমিস্রা রজনীতে এক একটীকে লক্ষ্য কর। তখন দেখিতে পাইবে, বিভার কি স্বর্গীয় দ্যুতি, কি জ্যোতির্ম্ময় রূপ! সে রূপ-জ্যোতিতে তেজ আছে, অথচ মাধুরী আছে; সে রূপের বিভায় উজ্জ্বলতা আছে, অথচ স্নিগ্ধতা আছে। তারা যেন সেই রূপ-বিভা লইয়া তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসেন। যেন স্বর্গের কি সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আসেন। তোমার কল্পনা তাহাকে কবিত্বে পরিপূর্ণ করে। বিভা তখন স্বর্গের কাব্য রূপে প্রকাশিত হন।

বিভাবরী দেবী কি শুদ্ধ অনন্ত আকাশে তারা ছড়াইয়া পরিতৃপ্ত হন? কৌতুকিনী সেই বিভা জ্বালিয়া কত ক্রীড়া করিতে বসেন। সুরলোকের ঠিক সম্মুখেই তেমতি একটী

সাগরের অনন্ত দর্পণ বিছাইয়া সেই অগণ্য তারাবলিকে প্রতি-বিম্বিত করিয়া দেখান। স্বর্গে অনন্ত নীলাম্বরে অগণ্য তারা, মর্ত্ত্যে অসীম নীলাম্বু রাশিতে অগণ্য তারা। এই অনন্ত তারকা-রচিত-সিংহাসন মধ্যে দেবী কি গভীর অন্ধকারে বসিয়া আছেন! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাকার রূপসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া একবার দেখ, রজনীর কি অন্ধ-রূপ, আর বিভার কি সৌন্দর্য্য! আকাশ পাতালে বিভার সমান সৌন্দর্য্য ও সমান রূপ। আকাশে তুমি সেই তারকা-বিভার যে রূপরাশি দেখিয়াছ, পাতালেও দেখিবে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। এ তারাও তেমনি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, এ তারাও তেমতি সুন্দর, তেমতি উজ্জ্বল, তেমতি ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ, তেমতি স্বর্গীয়রূপে-রূপবতী, তেমতি স্নিগ্ধ, তেমতি মনোহর, তেমতি জ্যোতির্ম্ময়ী, তেমতি কবিত্বে পরিপূর্ণ। নীল সাগরের অনন্ত জল রাশিতে ইহার বিভা সমান তেজে বিনির্গত হইতেছে। অন্ধকার রজনীতে যিনি সাগরবেলায় দাঁড়াইয়া একবার স্বর্গে মর্ত্ত্যে নেত্রপাত করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন, বিভার সৌন্দর্য্য ও তেজ সর্ব্বস্থলেই অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে।

শুদ্ধ আকাশ-পাতালে বিভার রূপ দেখাইয়া বিভাবরী-দেবী ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি স্থলেও বিভার বাতি জ্বালাইয়া দিলেন। প্রান্তরে, কান্তারে, কাননে, সরোবরে, পর্ব্বতে, গহ্বরে, নিকুঞ্জে,—যেখানেই আঁধার আছে, সেইখানেই বিভার দীপ্তি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। দূরে থেকে দেখ, বিভার শত বাতি জোনাকী জ্বালিয়া তোমার চিত্তহরণ করিতেছে। তুমি কি সে দৃশ্যের শোভা দেখিয়া বল নাই, এ জগৎ যথার্থই কাব্যময়! দূরে থেকে

যে কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে-পুঞ্জে বিভার বাতি-জ্বালা দেখিয়াছ, একবার নিকটে গিয়া দেখ, আরও কত শোভা বিভার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কোথাও স্তবকে স্তবকে, কোথাও এক একটি, কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে, কত বর্ণে কত ফুল,কোথাও উজ্জ্বল ভাতিতে, কোথাও কমনীয় কান্তিতে, কোথাও কোমল সৌন্দর্য্যে, কোথাও বিমল বিভায় তোমার চক্ষে রূপ-রাশি ছড়াইয়া দিয়াছে। সে রূপ কি সুধু দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে দিবে, তোমাকে সৌরভে আমোদিত করিয়া অতি কোমল ও নীরব ভাষায় বলিবে,—আমার রূপে যে কেবল সৌন্দর্য্য আছে এমত নহে, এ রূপ—সৌরভের ভাণ্ডার, কোমলতার আধার, বিমলতার আদর্শ, দেবতার ভূষণ এবং শান্তির নিকেতন।

জলে, স্থলে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বস্থলেই অন্ধকারে বিভার বিমোহন কান্তি দেখিয়া, যখন তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তখন বিভাবরী আর এক নূতন বেশে বিভার সৌন্দর্য্য দেখাইতে গেলেন। তিনি বিভায় কিরীটিনী হইলেন। অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বিভা তাহার শিরোভূষণ হইল। তখন বিভাবরী বিভার রাজ-রাজেশ্বরী। জগন্ময় তখন বিভার কৌমুদীময় ঐশ্বর্য্যে ছাইয়া দিলেন। জগৎ যখন এই কৌমুদীর ঐশ্বর্য্যে হাসিতেছে, সে হাসিতে যোগ দিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে প্রসূন সকল আপনাদের রূপ-রাশির বিমোহন বিভা দেখাইতে সদর্পে প্রকাশিত হইল। কার বিভা ভাল বলিবে? কৌমুদীর স্নিগ্ধ বিভা ? না,প্রসূনের সুকুমার বিভা? কার বিভায় অধিক সৌন্দর্য্য? কৌমুদীর জগৎব্যাপ্ত বিস্তারিত বিভায়, না কুমুদিনীর ক্ষুদ্র আয়তনে রাশীকৃত রূপের বিভায়? হায় বিভা, তোমার কি বিমোহিনী শক্তি! তুমি

কৌমুদীর বিমোহিনী শক্তি-প্রভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিলে—জগৎ তখন বিভাবরীর ক্রোড়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে লাগিল। জগৎকে নিদ্রাভিভূত করিয়া মোহিনী বিভাবরী কি করিতে গেলেন? সুধাকরের সুশীতল স্নিগ্ধ বারি লইয়া ধীরে ধীরে শিশিরপাতে উদ্ভিদ্ জগৎকে সতেজ করিতে লাগিলেন। আর জীব-জগৎকে ক্রোড়ে বিশ্রাম দিয়া সতেজ করিয়া নিশার শেষ শোভা দেখাইবার জন্য নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। জগৎকে নবজীবনে পুনর্জীবিত করিয়া এক নূতন চক্ষে বিভার আর এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিলেন। যাঁহার শিরে সুধাকরের সুধাভাণ্ডার, তাঁহার কি কখন সঞ্জীবনী শক্তির অভাব হয়? তিনি নির্ভাবনায় সকলকে অচেতন করিতে পারেন। এখন জগৎ এত নিস্তব্ধ, এত নীরব যে, এই সময়ই বুঝি কোন যোগ-সাধনার উপযুক্ত অবসর। নিস্তব্ধ জগতে বিভাবরীদেবী বুঝি একবার যোগিনী সাজিলেন। যে বিভাবসু তাহাকে এত যত্নে সজ্জিত করিয়াছেন, একবার বুঝি, তাঁহারই ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমীরণ সহস্র ফুলের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া স্বর্গাভিমুখে ধূপদানে ব্যস্ত রহিল। দীপরূপে চন্দ্র জ্বলিতে লাগিল। নিশির শিশির পবিত্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। তারকাবলি পুষ্প-রত্ন রূপে শোভা পাইতে লাগিল। সমীরণ চারিদিকে সুস্বর ধ্বনি করিয়া মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল। এমত নিস্তব্ধকালে, এমত সুস্থিরভাবে, এমত পূজোপ-করণে কি কেহ কখন সূর্য্যারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বিভাবসু যোগিনীর আরাধনায় যেন অস্থির হইয়াই ক্রমে ক্রমে তাঁহার

সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তখন উল্লাসে ধ্যানমগ্না বিভাবরী দেবী জীব-জগতের প্রাণিগণকে একে একে নিজ সঙ্গীত গুণে জাগাইতে লাগিলেন।

এবার বিভাবসু উদিত হইবেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার প্রথ বিভা দেখিবার জন্য জগৎ সহস্রলোচনে চাহিয়া রহিল। সে বিভার জন্যই যেন কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষী সকল অপেক্ষা করি আছে। পুষ্প সকল ফুটিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। সমী রণ সুশীতল ও পবিত্র হইবার জন্য সমুদ্রে স্নান করিতেছে শিশির পাতায় পাতায় পতিত হইয়া শাখীগণকে সতেজ করিয় নবশোভায় সজ্জিত করিয়াছে। সুধাকর নিজ সুধাদানে মৃতপ্রা জগজ্জনকে বাচাইবার জন্য ধীরে ধীরে কৌমুদী-আধারে সুধাব করিতেছেন। সুধাসিক্ত কৌমুদী কিছু নিষ্প্রভ হইয়া পা তেছে। ব্রাহ্মণগণ পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সন্তা পিত ও ভাবনা-যুক্ত জনগণ পূর্ব্বাভিমুখে চাহিয়া আছে। দিশ হারা পথিক একদৃষ্টিতে এক মাত্র আশার দিকে চাহিয়া আছে এত ঔৎসুক্যে কি কেহ স্থির থাকিতে পারেন? জগতের আশার ন্যায় বিমল দ্যুতিতে অনন্ত সাগর হইতে পূর্ব্বদিকে বিভাবসুর প্রথম বিভা বিকাশিত হইল। আর জগতের উল্লাস দেখে কে? ঐ আশার দীপ্তির মত সুখতারা উদিত হইয়াছে। ঊষাদেবী কি মোহনবেশে জগতে দেখা দিলেন! এত সৌন্দর্য্য কি আর কাহারও আছে? বিভার অতুল্য বিশদবরণে তাঁহার বদনদেশ শোভিত। সুখতারার সিন্দুর বিন্দু তাঁহার ললাটে। দেবী হাসিয়া হাসিয়া যেন উল্লাসে নিকুঞ্জে গাহিয়া উঠিলেন। কমল রূপ নয়ন খুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। সে নয়নে

নির্মল প্রেম-অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সৌরভে আমোদিত হইয়া স্নিগ্ধ সমীরণ-সহচরী জীবগণকে স্পর্শ করিয়া জাগরিত করিতে লাগিলেন। প্রেমিকা প্রভাবতী সতী প্রভাকরের পূজার জন্য শোভারঞ্জিত পুষ্প সকল আহরণ করিতেআসিলেন। যে ঋষিগণের দেহে বিভার লাবণ্য ফুটিয়াছে, তাঁহারা পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া পূজায় বসিলেন। পূজায় ঋষি উষার এই প্রথম বিভাতে নারায়ণের মূর্ত্তি দেখিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি বিভাকরং॥

প্রতিধ্বনি গম্ভীরে গাহিল ঃ—

প্রণতোঽস্মি বিভাকরং।

ঋষি আবার গাহিলেন—

"পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে,
পবিত্র ভাস্কর।
নব সমুদিত, বিশ্ব-আলোকিত,
নমো বিভাকর।
তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব চরাচর।
পাপ বিনাশিয়া, লও পুণ্য-পথে,
নমো বিভাকর।"

হিন্দুঋষি যেখানে এইরূপ বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের আভাস পাইয়াছেন, সেই খানেই তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন—গায়ত্রীর গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহার জবাকুসুম-

সঙ্কাশ সর্ব্বপাপঘ্ন বিভাকরের উপাসনা জড়োপাসনা নহে; জড়োপাসনা কাহাকে বলে, হিন্দুঋষি তাহা জানিতেন না ;—তিনি কেবল বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের অনন্তমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছেন। *

অন্তর্জ্জগতে।

বহির্জ্জগতের যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, মানবের অন্তর্জ্জগতেও তদনুরূপ একটী চিত্র আছে। আমাদের অন্তর্জ্জগতেও সন্ধ্যা আছে, তমিস্রা রজনী আছে, রজনীর মধ্যে—তারকা, চন্দ্রোদয়, জ্যোৎস্নার বিভালোক—সকলই আছে। শৈশব-কালে মানব যখন নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ থাকেন, তখন তিনি দিবালোকে হাসিতে থাকেন। মায়ারূপিণী যশোদা-দেবী তাঁহাকে লালন পালন করিতে থাকেন। তাঁহার কতই ক্রীড়া দেখেন। তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবন শত শশীর বিভায় আলোকিত থাকে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানবের বিষয়-বাসনা যখন বাড়িতে থাকে, মানবজীব তখন বিষয়বাসনা-রূপিণী যমুনা কূলে কংসরাজ্য মথুরার অনুকূ

* আধুনিক ইংরাজীওয়ালারা মনে করেন, হিন্দুরা সূর্য্যস্তোত্রে জড়ের উপাসনা করেন। একথা ঠিক নহে। হিন্দুরা কোন কালে কোথাও জড়ের উপাসনা করেন নাই। ইংরাজীতে যাহাকে Nature-Worship বলে হিন্দুর পূজা সেরূপ Nature-Worship নহে। তিনি বাহ্য স্থূল জগতে যেখানে দেবভাবের বিকাশ দেখিয়াছেন, সেইখানেই সেই স্থূলকে ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণ-দেবতারই পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যদেবে সর্ব্বপাপঘ্ন মূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন। এইরূপে হিন্দু অনন্ত নারায়ণের তেত্রিশ কোটি দেবরূপ কল্পনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই। মানব কি সেই অনন্ত দেবকে তেত্রিশ কোটিরূপে নিঃশেষ করিতে পারেন? তাহা কেবল মানব-জ্ঞানের সীমা মাত্র, অনন্ত দেবতার শেষ নহে।

■ণ করে। ভোগে ও মায়ায় মানব-আত্মা যতই জড়িত হয়, ■তই আত্মার মলিনতা জন্মে। মানবজীবনে তখন সন্ধ্যা হয়। ■ন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী আইসে। এই রজনীতে ■ষয়ের স্বপ্ন সকল মানব-জীবনকে কথঞ্চিৎ আলোকিত করে। ■ সুখ-সকল তারকার ন্যায় সেই অন্ধকারে জ্বলিতে থাকে। ■নবের এই যৌবনের প্রারম্ভে তাহার সমুদয় ভোগবৃত্তির উদ্রেক ■য়। ক্রমশঃ উহারা বলবতী হইতে থাকে। এ সময়ে মানবের ■পু-সকল যখন বলবান্ হইয়াছে, মানব যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া ■ার্য্য করিতেছেন, তখন তিনি কংস—তাঁহার হৃদয়-রাজ্য মথুরা, ■াহার প্রবৃত্তিস্রোত যমুনা। যৌবনের এই উদ্যোগী অবস্থাকেই ■ানবের জাগ্রৎ অবস্থা বলে। এই জাগ্রৎ অবস্থা যতই বাড়িতে ■াকে, ততই মানব-জীবনের ভোগ ও ঐশ্বর্য্য বাড়িতে থাকে। ■শ্বর্য্যভোগের সহিত মানবজীবনে দ্বারকা উপস্থিত হয়। কুরু-■ক্ষেত্রের (কার্য্যক্ষেত্রের) যুদ্ধেই মানবের ভোগ ও জাগ্রৎ অব-■ার শেষ। তখন বিজয়ী ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির বিষয়-ভোগের ■িংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি-পথে আইসেন। সে যাহা হউক, মানবজীবন যখন পাপ-তাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ■খন কেবল বিষয়-সুখের তারকারাজি অন্তঃপুর আলো-কিত করিতেছে, যখন কংসরাজ তাহার হৃদয়-সিংহাসন সম্পূর্ণ-■পে অধিকার করিয়া রাজ্যভোগ করিতেছেন, যখন ধর্ম্ম-ভক্ত-■সুদেব, ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-রূপিণী দেবকী কারাবদ্ধ, তখন কি মানব ■কদা পাপতাপে অনুতপ্ত হইয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে চাহেন ■া? যদি চান, তখন কি হৃদয়ে ঘোর গণ্ডগোল উঠে না? ■ক দিকে পাপ-প্রবৃত্তি সকল বলবতী, অন্যদিকে পুণ্যপ্রবৃত্তির

ক্রম-স্ফূর্ত্তি। হৃদয়ে এই পাপ-পুণ্যের তুমুল সংগ্রাম,—ঘোর যুদ্ধ। এই তুমুল সংগ্রামে ধর্ম্মবীর-হৃদয়ের দেব-ভাবেরই জয়। ধর্ম্মবীরের দেবভাব ধীরে ধীরে জয়ী হইতে থাকে। দেবভাবের ঈষৎ বিভা হৃদয়ে উদয় হইতে থাকে। ঘোর ঝঞ্ঝাবাত ও ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব হয়। হৃদয়ে পুণ্য জীবনের প্রভাত হইতে থাকে। তাহাই কৃষ্ণের জন্ম—হৃদয়-রজনীর চন্দ্রোদয়। অর্দ্ধ-রাত্রে এই চন্দ্রোদয় হয় বলিয়া এই হৃদয়-রজনীকে একদিন অষ্টমীর রাত্রি বলা যাইতে পারে। এই মহা অষ্টমীতে যখন হৃদয়ে একদা দেবালোকের আবির্ভাব হয়, মানব তখন তাহাকে এক দুর্লভ রত্ন মনে করেন। যে হৃদয়ে পুণ্য, সেই হৃদয়েই পাপ, পুণ্য পাপেরই অন্তরঙ্গ। পাছে পাপের প্রাবল্যে আবার পুণ্যের বিনাশ হয়, এজন্য সাধু সেই পুণ্য রত্নকে, সেই গলকন্দার হীরক বিভাকে, সেই অতলস্পর্শের মুক্তা-বিভাকে অতি যত্নে রক্ষা করেন। বিষয়-বাসনা স্রোতের যমনা পার করিয়া সে রত্নকে অন্তরঙ্গ কংসের ভয়ে হৃদয়ের অতি নিভৃত দেশে সঞ্চিত করিয়া রাখেন। এই নিভৃত দেশ, গোপালয়—গোপালয় হৃদয়ের দেবালয়—(কারণ, গোপ শব্দের অর্থই প্রজাপালক দেবতা) —এই দেবালয় আনন্দ-ধাম—ইহাকেই নন্দালয় বলে। এই নন্দালয়ে দেবভাব ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া কংসকে জয় করে। তখন বসুদেব ও দেবকী মুক্ত হয়েন। হৃদয়ের জ্যোৎস্না ফুটে। আর্য্যঋষির হৃদয়ে যখন একদা এইরূপে দেববিভার উদয় হইয়াছিল, যখন ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের বিভায় তাঁহার অন্তঃপুর আলোকিত হইয়াছিল, তখন তিনি সেই জন্মাষ্টমীতে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে আর্য্যঋষির ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ। তিনি এখন কর্ম্মী। তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্মভাবে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, অন্তরের আসুরিক পশুভাবের এখনও প্রাবল্য রহিয়াছে। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রবল রহিয়াছে। এ চৈতন্য তাহার পূর্ব্বে ছিল না। তখন তিনি নিকৃষ্ট পশুভাবকে পরম অসুর বলিয়া জানিতে পারিলেন। এই জ্ঞান-বিভায়, চৈতন্য হওয়াতে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত তেজ ও বীর্য্য ধর্ম্মোন্মুখ হইল। অন্তরের সিদ্ধিদায়িনী বুদ্ধিও ধর্ম্ম-রক্ষিণী হইল। জ্ঞান (সরস্বতী) ঐশ্বর্য্য (লক্ষ্মী) তেজ (কার্ত্তিকেয়) ও সিদ্ধিদায়িনী বুদ্ধি (গণপতি) একত্র হইয়া ধর্ম্মোন্মুখ হওয়াতে অন্তরে যে অপূর্ব্ব ভগবৎ শক্তির (ভগবতী) উপচয় হইল, সেই শক্তি-প্রভাবে তিনি সেই অসুরকে (মহিষাসুর) সিংহবলে পরাজয় করিলেন। এই জয়ের নাম দুর্গোৎসব। অন্তরে ভগবৎশক্তি সকল অসুরকে জয় করিতেছে। কিন্তু এখনও অন্তঃপুর নিষ্পাপ হয় নাই। পাপ রক্ত-বীজের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিতেছে। শ্যাম তখন শ্যামারূপিণী হইয়া ধর্ম্ম-অসি করে ধারণ করিয়া সমস্ত পাপ-বীজ নির্ম্মূল করিলেন। তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের আন্তরিক সংগ্রাম থামিল। মন ধর্ম্মভাবে সুস্থির হইল। ইন্দ্রিয় বিজিত হইল। আজি হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয়। সমস্ত পশুভাবের বলি হইয়াছে। তাই হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ধর্ম্মবলে বলবতী হইল। কার্ত্তিকেয় অন্তরের ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে ঋষি-হৃদয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইলে অন্তরে বৃন্দাবন ফুটিল। ধর্ম্মজয়ের আনন্দ-কুসুম সকল বিকসিত হইল। হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সমুদায় অন্তঃপুর সেই কুসুমে পরিপূর্ণ। প্রেম-পরিমলে সেই কুসুম সকল আমোদিত।

মানব-প্রকৃতি এখন আত্মার বশীভূত ও ক্রীড়নক। আজি হৃদয়ের রাস। ধর্ম্মের পূর্ণশশী অন্তরে উদয় হইয়াছেন। প্রকৃতি-সুন্দরী পুরুষের ধর্ম্মরমণে মাতিয়াছেন। এ উন্মত্ততা কি হৃদয়ে ধরে তখন অন্তরে এক নূতন জীবন উপস্থিত। তখন অন্তরের বসন্ত কাল। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এক নবজ্ঞান-বিভায় জীবিত হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের শেষ হইয়াছে; জীব এখন জ্ঞানী। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইলেন, বসন্ত পঞ্চমীর জ্যোৎস্নার মত সেই তত্ত্বজ্ঞান অন্তরকে প্রভাসিত করিল। তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী হৃদয়ে বিরাজিত। এই নবদ্বার বিশিষ্ট দ্বারকাপুরে এখন ভগবান্ রাজা। কে আজি দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখে! আজি যোগী সিদ্ধ হইয়া বিভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সাধনা জ্ঞান-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছে। সেই জ্ঞানমগ্ন আর্য্যঋষির হৃদয়ে আজি দেবদোল। সমস্ত অন্তর্জগৎ ভগবানকে লইয়া রমণ করিতেছে। সকল প্রবৃত্তি, সকল অনুরাগ, কেবল ভগবান্ জ্ঞানেই মোহিত। তত্ত্বজ্ঞানের এই নবানুরাগে সমুদায় অন্তঃপুর রঞ্জিত হইল। প্রকৃতিদেবী আজি পুরুষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ও দোদুল্যমান। কিন্তু আজিও যোগীর হৃদয় সবীজ সমাধিতে মগ্ন। তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার সকল আজিও নিস্তেজ হয় নাই। এখনও আত্মার সম্পূর্ণ মলিনতা ঘুচে নাই। সবীজ আত্মা নির্ব্বীজ হইতে চায়। এই স্থলে আর এক মহা সংগ্রাম উঠিল। এখন ভগবৎ-শক্তি কেবল জ্ঞান-অস্ত্রে সজ্জিত। চিত্তের সংস্কার সকল শত রূপ (দুঃশাসনাদি) ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের মত পরাক্রমী হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তিরূপিণী দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হইয়াছেন। জ্ঞানের সহিত আজি সংসার-বীজের তুমুল সংগ্রাম।

রাম (কৃষ্ণ) জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ হইয়া আজি ধর্ম্ম, বল ও বীর্য্যকে উত্তেজিত করিতেছেন। ধর্ম্ম, (যুধিষ্ঠির) বল (ভীম) বীর্য্য, (অর্জ্জুন), তত্ত্বজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া সংসার-বীজ নির্মূল করিতে চলিল। আজি কুরুকুলের ধ্বংস হইবে। তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক বীর্য্যকে এ ধ্বংসের পক্ষে গীতায় উপদেশ দিলেন। নহিলে আত্মা মুক্ত হইবে না। এই উপদেশের পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিল। কুরুকুলের ধ্বংস হইল। চিত্তের সংস্কার বীজ অন্তঃকরণ হইতে একেবারে উন্মূলিত হইল। ভক্তি এখন পূর্ণকাম হইয়া সাধনা ও যোগপথের শেষে আসিয়াছেন। এখন এই ভক্তি, সাধনা ও যোগ সকলেরই শেষ হইয়াছে। জ্ঞান-সমুদ্রের এক মহোচ্ছ্বসিত তরঙ্গে অন্তরের সমুদায় বৃত্তি ও সংস্কার ভাসিয়া গেল। কুরুকুল-ধ্বংসের পরই যদুকুল-ধ্বংস হইল। অন্তরে এখন চিত্তলয় উপস্থিত। এই চিত্তলয়ের নাম যদুকুল-ধ্বংস। আত্মা এখন চিন্ময় মাত্র। ভগবান একাকী বিদ্যমান। তিনি পরমাত্মাতে লয় হইবেন। আর্য্যঋষি তখন নির্বীজ সমাধিতে সিদ্ধ হইলেন। এই সিদ্ধির ছবি কি সুন্দর! এখন আত্মা, চিরন্তন সুখস্বরূপ—চিরন্তন বিভাস্বরূপ—সেই বিভাবসু পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আত্মার রজনী শেষ হইয়াছে। ঐ যে অন্তঃকরণে কি এক অপূর্ব্ব রাগরঞ্জিত বিভার আভাস দেখা দিল, ঐ বুঝি আত্মার ঊষাকাল। ঐ অনন্ত সুখের তারকা উঠিয়াছে। ঐ পরমাত্মার আভা দেখা দিয়াছে! উহার বিভা কতই উজ্জ্বল! অন্তরে আর আনন্দ ধরে না। সাত্ত্বিক কাননের পক্ষিগণ উল্লাসে গাহিয়া উঠিল। দিশাহারা পথিকের ন্যায় আত্মা পথ দেখিতে পাইলেন। ঊষার আলোকে জ্যোৎস্না মিলাইতে লাগিল।

আত্মার মলিনতা ও অন্ধকার ক্রমে সমুদায় অপসারিত হইল একে একে কাননের সিদ্ধি-কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠিল। শান্তি রূপিণী বিমল বিভাবতী সতী আসিয়া পুজোপহার জন্য কুসুম সকল আহরণ করিলেন। জবাকুসুম-সঙ্কাশ অরুণরূপী পরমাত্মার আবির্ভাব হইল। বিভাবসুর মুখ সন্দর্শন করিবামাত্র মলিনতাযুক্ত আত্মার মুক্তিলাভ হইল। রজনী যেমন দিবসের বিভায় মিশাইয়া যায়, আত্মাও তেমনি পরমাত্মার আলোকে মিশাইয়া গেলেন। অন্তঃকরণে চিরসুখ ও চির-আনন্দ দিবা বিভার ন্যায় প্রভাসিত হইল। এই বিভাই—বিভা। এই বিভা লাভ করিয়া কবে আমরা চির সুখী হইব।

কাব্য——বনবাসে।

বাল্মীকির বন।

বনবাসের সুখ প্রাচীন কালের মুনিঋষিগণ জানিতেন। তাঁহারা সেই সুখে সুখী হইয়া সুবর্ণময় রাজপ্রাসাদের ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যসুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। তাঁহারা বনবাসের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে লোকালয়ের কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাঁহাদের শান্তি-রসাস্পদ বনাশ্রমে হিংসা দ্বেষ প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। সকলেই মিত্রতায় ও সদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়া বনে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। এমত কি, হিংস্র বন্য পশুগণও দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঋষিগণ-সঙ্গে একত্র সদ্ভাবে বিচরণ করিত। ঋষিগণ তাহাদিগকে কখন হিংসা করিতেন না, তাহারাও ঋষিগণের প্রতি বিদ্বেষ ও সঙ্কুচিত ভাবে দর্শন করিত না। কিন্তু আজি সে প্রাচীন ঋষিসমাজ নাই, বনবাসের সে সুখশান্তিও নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। রাম-রাজত্ব কালে বনবাসে যে কত সুখ ও শান্তি ছিল, তাহা রামায়ণ-পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। সে শান্তির কথঞ্চিৎ বিঘ্নোৎপাদন হইলে, রামচন্দ্র অনতিবিলম্বে সে বিঘ্নের বিনাশ সাধন করিতেন। তিনি যখন বনবাসে গিয়াছেন, এইরূপ কত স্থানে কত বিঘ্ন বিনাশ করিয়া আশ্রমপদের শান্তি-বিধান করিয়াছেন। সীতা দেবী

শান্তিরূপিণী হইয়া সর্ব্বময় শান্তিবিধান জন্যই রামের স বনবাসিনী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেখানে গিয়াছেন, সে খানেই শান্তি বিরাজিত হইয়াছে। সেকালে লোকালয়ে সু ছিল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত বনবাসে তদপেক্ষা অধিকতর সু শান্তিরূপে বিরাজিত ছিল। লোকালয়ে বিষয়-সম্ভোগের সুখ বনাশ্রমে সাত্বিকভাবের প্রশান্তরসের স্থায়ী সুখ। অরণ্য-প্রধান ভার তের সর্ব্বত্রই তখন সংসার-ধাম। কি জনপূর্ণ রাজধানী, কি বিজন কানন, তখন সর্ব্বস্থলেই লোকালয়। অযোধ্যার রাজ ধানীতে তখন সংসার; প্রতি জনপদে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গ্রামে তখন সংসার; আবার মহারণ্যে, কাননে, ও নিকুঞ্জে তখন তাপসগণের সংসার। মুনিগণও স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে সংসার বিরচন পূর্ব্বক সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করিতেন। রামায়ণে মুনিঋষিগণের সংসারাশ্রম-সুখ ও বানপ্রস্থ শান্তির অনেক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রামচন্দ্র বনবাসের দশ বৎসর কাল আশ্রমে আশ্রমে বেড়াইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিতা সীতাও অযোধ্যার রাজসুখে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকি-আশ্রমে মুনি-কন্যাগণের সহিত অন্যবিধ সুখস্বচ্ছন্দে তিনি বাস করিয়াছিলেন। এই জন্য বলি, সেই প্রাচীন কালে, সেই রাম-রাজত্ব কালে বনবাসেও সুখ ছিল। কবির কল্পনা এত সুন্দর যে, আমরা এক একবার বনবাসের সুখকে লোকালয়ের সুখ অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞান করিতে থাকি। রামচন্দ্রের সহিত বনবাসে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া আমাদের একদা ইচ্ছা হয়, আমরাও মুনি ঋষিগণের সঙ্গে সেইরূপ আশ্রমপদে গিয়া বাস করি। আবার যখন রামরাজত্ব-কালে অযোধ্যার সুখ

দেখি, তখন আর সেই বনবাসের সুখ তত প্রিয় জ্ঞান হয় না! কবি এইরূপ জগৎ সংসারময় সুখে পরিপূর্ণ করিতে পারেন।

প্রাচীন ভারতে অরণ্যও কেমন লোকালয় ছিল, তাহার বিশদ চিত্র আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই। তখনকার বন যে শুদ্ধ মুনিঋষিগণের পুণ্যাশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল এমত নহে, এই আশ্রমের পথ-সকলও অরণ্যবাসিগণের বিদিত ছিল। মুনিঋষিগণ আশ্রমে আশ্রমে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের বনপথ অতি পরিস্কৃত ও নিরুপদ্রব ছিল। তখন অরণ্যদেশ-সকল কেমন ঋষিগণের পরিচিত ছিল, এই দেখুন, তাহার একটী বিশদ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ রামকে অগস্ত্যাশ্রমপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন :—

"রাঘব! তুমি জানকীর সহিত অগস্ত্যাশ্রমে গমন করায় যেস্থানে মহর্ষি আছেন, আমি তাহার পথ বলিয়া দিতেছি। তুমি এই আশ্রমের দক্ষিণে পঞ্চ যোজন পথ গমন করিলে একটী উজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন আশ্রম দেখিতে পাইবে, উহা সেই মহর্ষি অগস্ত্যের ভ্রাতা ইধ্মবাহের আশ্রম,—সেই বনের অধিকাংশই স্থলভাগ। উহা পিপ্পলীবনে পরিশোভিত এবং বহুবিধ পুষ্প ফলে অতীব রমণীয়। তথায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ নিরন্তর মধুরস্বরে কূজন করিয়া থাকে। কোনস্থানে নির্ম্মল জলপূর্ণ ও রাজহংস-শোভিত জলাশয় রহিয়াছে, তাহার তটে চক্রবাক সকল বিচরণ করিতেছে, এবং নানাবিধ কমল-কুসুমে ঐ সরোবর অতি সুন্দর দেখাইতেছে। রাম! তুমি এক রজনী সেই আশ্রমে বাস করিবে। যামিনী প্রভাতা হইলে ঐ বনখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে এক যোজন-পথ যাইবে, তাহা হইলেই মহর্ষি

অগস্ত্যের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সেই বহু-পাদপ-শোভিত রমণীয় আশ্রমবনে তুমি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পরমানন্দে বিহার করিতে পারিবে।”

বাস্তবিক, সেকালে বনদেশ সর্ব্বাংশেই শান্তির আস্পদ সংসার-ধামে পরিণত হইয়াছিল। তথায় জনপদ ও রাজধানীর কোলাহল ও পীড়ন ছিল না, অশান্তি ও উপদ্রব ছিল না, ভয় ও দুঃখ ছিল না, অথচ সংসারের সকলই ছিল। মুনিঋষিগণ অভ্যাগত অতিথিগনকে দশদিন আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন। শত শত শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। কখন কোন তপোবিঘ্ন অশান্তি উপস্থিত হইলে অমনি ঋষিগণ রাজসহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহা নিবারণ করিতেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা রাজধানীর ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা দেখিতে পাই। পূর্ব্বতন রাজধানীর ঐশ্বর্য্য সেই প্রাচীন কালেও কত মহার্হ ও রত্নময় ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার বিচিত্র চিত্র রামায়ণে অঙ্কিত হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্যে মন চমৎকৃত হইলে, আমরা একেবারে বনবাসে আসিয়া পড়ি। বনে অন্যবিধ সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও কুসুমময় শোভার স্থলে প্রকৃতির মোহন মাধুরী দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। চিত্রের বৈপরীত্য হেতু এই শোভা যেন অধিকতর সুন্দর বোধ হয়। বাল্মীকির হস্ত-স্পর্শে সর্ব্বদেশ সুন্দর হইয়া পড়ে। যেখানে বাল্মীকির উদয় হইয়াছে, সেইখানেই অরণ্য নিকুঞ্জ-শোভা, সরোবর কমলবনের শোভা, নদীকুল কলহংসের শোভা, এবং চিত্রকুট-নন্দন-কাননের শোভা ধারণ করিয়াছে। বাল্মীকি যেন সর্ব্বদেশে কুসুম বিকীর্ণ করিয়া যাই-

তেন। তাঁহার সীতা যেমন প্রতি তাপস-আশ্রমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তেমনি বনে বনে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, রাম বনপথে কিরূপে গমন করিতেছেন।

"রাম সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া এবং মধ্যে জানকী ও পশ্চাদ্ভাগে ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে রাখিয়া বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, রমণীয় কানন, নির্ম্মল সলিলপূর্ণ স্রোতবতী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক সকল, বিকচকমলালঙ্কৃত ও জলচর পক্ষী সহিত রম্য তড়াগ, মদোন্মত্ত সবিন্দু হরিণযূথ, দীর্ঘ-বিষাণ মহিষগণ, ও দ্রুমারি করী সকল দেখিতে দেখিতে দূরবনে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। তখন সেই রম্য বনমধ্যে চতুর্দ্দিকে যোজন-বিস্তীর্ণ বিকসিত রক্তোৎপল ও পুণ্ডরীক সমূহে সমলঙ্কৃত, সারস কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিসঙ্কুল, মৃণাল-ভক্ষণাশয়ে সমাগত তীরবর্ত্তী গজযূথে পরিশোভিত ও প্রসন্ন-সলিল-পূর্ণ এক রমনীয় সরোবর তাঁহাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইল। সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র সেই সরোবরের অভ্যন্তর হইতে সুমধুর গীত বাদিত্ররব তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গীতকারী লোক সকল দৃষ্টিগোচর হইল না।"

বাল্মীকির বন এইরূপ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। রামবনবাসের দশ বৎসর কাল পরম সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি লক্ষ্মণ ও সীতা সঙ্গে মুনিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া আশ্রমে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, বনের নানাস্থানে বিহার করিয়া

বেড়াইয়াছিলেন এবং বিচিত্র গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটী বনে সীতার কুসুমবন-শোভিত নিকুঞ্জ-কাননে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশান্ত সুখে বাস করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, প্রকৃতি-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-অঙ্কনে বাল্মীকি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার মনে প্রকৃতিদেবী হাসিয়া বেড়াইতেন।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা যেন যথার্থ কোন বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এমত অনুভব হয়। বাল্মীকি অনেক স্থলে বনের সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। তিনি এক এক স্থলে তুলিকা-হস্তে যেন স্বভাব-সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়া যাইতেছেন। কোথাও তাল তমালের বৃহৎ অরণ্যানী ঘন-ছায়ায় আচ্ছাদিত; পত্রে পত্রে, গুল্মে গুল্মে, লতায় লতায় জড়িত, এবং হিংস্র বনজন্তুতে নিনাদিত ও আকুলিত; কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ নিকুঞ্জ-শোভিত, হোমাগ্নিধূমে ধূসরিত ও বেদগানে মুখরিত; কোথাও সরোবরে কমলবন প্রস্ফুটিত ও জলচর পক্ষিগণ-সুশোভিত, কোথাও পঞ্চাপসরের মধুর সঙ্গীতরবে প্রতিধ্বনিত, কোথাও পার্ব্বত্যদেশ সুন্দর ওষধিমালায় পরিপূরিত, কুসুমে কুসুমিত ও তরুমালায় আচ্ছাদিত; কোথাও জানকী নানা বন-দেশের শোভা দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া যাইতে-ছেন; কোথাও বা বনপথের জটিলতা ও কুটিলতায় বিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও কানন-লতা গাছে গাছে উঠিয়া বনশোভা বাড়াইতেছে, কোথাও বল্লরীবাহু সীতাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রসারিত হইয়াছে। বনবাসে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা-দেবী যত দেশে যত শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই বনদেশের তত শোভা দেখিয়া বেড়া-

তেছি। মনে হইতেছে, আমরাও রামের সঙ্গে বনবাসে আছি। রামের বনবাস প্রকৃত বনবাস, রাম বন ব্যতীত অন্যত্র গমন করেন নাই। তিনি বরাবর বনমধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বনে বনেই ভ্রমণ করিয়াছেন, বনে মনি ও ঋষিগণের আশ্রম দেখিয়া ও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বেড়াইয়াছেন। সুতরাং আমরাও রামের সহিত কখন বনের বহির্দেশে আসি নাই। বনে বনে আমরা চিরদিন বনশোভাই দেখিয়াছি।

ব্যাসের বন।

কিন্তু মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস এরূপ নহে। যখন তুমি ব্যাসের বনে প্রবেশ করিবে, তখন আর তোমার অনুভব হইবে না যে, তুমি বনবাসে আছ। ব্যাসের বনে স্থানে স্থানে যে সামান্য বন-বর্ণনা আছে, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহা অন্য মহত্তর ও উজ্জ্বলতর চিত্রে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সে বনে বাহ্য-জগতের স্বভাবচিত্রকর কবির হস্তস্পর্শ যত না [illegible] হয়, তদপেক্ষা দার্শনিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, অন্তর্জগতীয় নিগূঢ় রহস্য-চিত্র এবং ধর্ম্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞ ঋষির পারমার্থিক কল্পনার সৌন্দর্য্য অধিকতর অনুভূত হইতে থাকে। ব্যাসের বনে সামান্য পার্থিব আরণ্য সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে প্রকটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই সেই সৌন্দর্য্য কৈলাসের স্বর্গীয় কল্পনাময় কান্তিতে বিমিশ্রিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—যক্ষরাজ-কুবেরের ঐশ্বর্য্যের সহিত সজ্জিত হইয়া বিকসিত হইয়াছে এবং সে সৌন্দর্য্য গন্ধমাদনের অপূর্ব্ব রমণীয়তায় শোভিত হইয়াছে, গন্ধর্ব্বদিগের মাধুরী ও লাবণ্যময় মোহনবেশে রঞ্জিত হইয়াছে, সুমেরু পর্ব্বতের স্বর্ণ

রঞ্জনে বিভাসিত হইয়াছে। বাস্তবিক, তাহাতে এত স্বর্গীয় দেবভাব মিশ্রিত হইয়াছে যে, আমরা ঠিক অনুভব করিতে পারি না যে, সে সৌন্দর্য্যকে পার্থিব বলিব, কি পারমার্থিক কল্পনার মানসিক সৌন্দর্য্যবিকাশ বলিব। বাল্মীকির মত ব্যাস শুদ্ধ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান নাই, তিনি পার্থিব বনদেশ ছাড়িয়া, আমাদের মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া অমরাপুরীতে দেবরাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে গিয়াছেন, এবং তাহাই অতি রমণীয় শোভায় চিত্রিত করিয়াছেন। ব্যাস বনবাসী পাণ্ডবগণকে বনে বনে ভ্রমণ করাইয়া যেন পরিতৃপ্ত হইলেন না, তিনি বনে বনে তত যেন নিজ তুলিকার উপযোগী চিত্রকরের সামগ্রী পাইলেন না, এজন্য তিনি পাণ্ডবগণকে বন হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ভারতময় তীর্থ পর্য্যটনে তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। তখন ব্যাস আপন কবিত্ব-বিকাশের উপকরণ পাইলেন। তখন তিনি নানা তীর্থের নানাবিধ সৌন্দর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। ব্যাস বাল্মীকির মত শুদ্ধ বনে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন, সমস্ত ভারত যেন তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। বন, বৃহৎ বন ও অরণ্যানী; নগর, উপনগর ও রাজধানী; পল্লী, উপপল্লী ও গণ্ডগ্রাম; তাপসকুঞ্জ, ঋষির আশ্রম ও মহা তীর্থধাম; পর্ব্বত গুহা, সরোবর নিকুঞ্জ, উপত্যকা, অধিত্যকা, তড়াগ, দীর্ঘিকা, নদ, নদী, প্রস্রবণ, কানন, বল্লরী, লতাকুঞ্জ, কিশলয়, পুষ্প, গুল্ম, উৎস, জলপ্রপাত, জলাশয় প্রভৃতি সকলই ব্যাসের কল্পনা আয়ত্তকরিতে চায়। ব্যাস এক দেশে এক দিকে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি আকাশে, পাতালে ও মর্ত্ত্যধামে একদা ভ্রমণ করিতে চাহেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার জ্ঞান-নেত্রে উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি

ও দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, সমস্তই চিত্র করিতে চাহে।
গুবগণকে বনবাসে আনিয়া ব্যাসের প্রতিভা যেন স্বাধীনভাবে
বার বিচরণ করিয়াছে। এখানে তিনি মুক্তভাবে সর্ব্বদেশে
ড়াইয়াছেন এবং আপন প্রতিভার সর্ব্বশক্তি বিকাশের অবসর
ইয়াছেন। এখানে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় তাঁহার প্রতিভাকে
বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। এজন্য, ব্যাসের বনে আমরা
মায়ণের মত তত পার্থিব বনের চিত্র অনুভব করিতে পারি
বাল্মীকি-বনের যে কবিত্ব, তাহা ব্যাসের বনে বিদ্যমান
কিলেও তত অনুভূত হয় না। কিন্তু ব্যাসের বনে আমরা
বিধ কবিত্বও প্রস্ফুটিত দেখি। ব্যাসের বন বাল্মীকির বনের
ত যে শুদ্ধ বাহ্য স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এমত নহে, সে বনে
র্শনিক পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এবং তত্বজ্ঞ ঋষির ধর্ম্মালোচনা এত
ধিক যে, সময়ে সময়ে আমরা কবিকে হারাইয়া পণ্ডিত ও ঋষি
মাজে অধিষ্ঠিত জ্ঞান করি। বাল্মীকির বনে সেরূপ পাণ্ডিত্য
নে স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার তত আধিক্য নাই।
কন্তু ব্যাসের বনে ঋষির মুখ হইতে সুদীর্ঘ ধর্ম্মবক্তৃতাময়
াক্য সকল অনর্গল শুনিতে থাকি। এক এক স্থানে মুনির
পর মুনি আসিতেছেন, আর বড় বড় শাস্ত্র-কথা বলিতেছেন;
ষির উপর ঋষি প্রবেশ করিতেছেন, আর ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্য সকল
বকাশ করিতেছেন। এ সকলের প্রাচুর্য্যে আমরা ঠিক অনুভব
করিতে পারি না, যে আমরা বনে আছি, কি পণ্ডিত-সমাজে
অবস্থান করিতেছি। অরণ্য মাঝে আমরা বনদেবীকে হারাইয়া
যন সরস্বতীকে মূর্ত্তিমতী দেখি। আবার মাঝে মাঝে আমাদের
ঋষিগণ এমনি এক একটি চমৎকার উপন্যাস কথা বলেন যে,

তাহাতে আমরা বনবাসের সকল দুঃখই যেন ভুলিয়া যাই। তখন আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা বনে, না কল্পনার রাজ্যে? বনের পার্থিব কঠিন সৌন্দর্য্যকে ব্যাস কাল্পনিক সুষমাময় সৌন্দর্য্যে পরিণত করেন।

ব্যাসের বন আবার শুদ্ধ বন নহে, তিনি বনে নগরশোভা প্রকটন করিয়াছেন। তিনি বন-শোভার সহিত নাগরিকশোভা মিশ্রিত করিয়াছেন। বাল্মীকির বনে আমরা রামকে দেখি তিনি বনবাসে আসিয়া যথার্থ ত্যাগীর ক্লেশ অনুভব করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব বনে গিয়া শুদ্ধ ত্যাগীর ক্লেশে চিরদিন অতিবাহিত করেন নাই, সেই ত্যাগীর ক্লেশ কথঞ্চিৎ রাজৈশ্বর্য্য-বিরচনে অপনীত হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব নিতান্ত দীনভাবে বনবাসে ছিলেন না, সেই দীনতার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে রাজসুখও মিশ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজযাত্রীর ন্যায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। পঞ্চপাণ্ডবের আশ্রমে যাও, সেখানে দেখিতে পাইবে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিত্য নিত্য সেবিত হইতেছে; সে আশ্রম অশ্ব, রথ ও গজাদিতে পরিপূর্ণ এবং রাজকেতনে সুশোভিত। জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণের পর দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবগণ রথে-রথে, কেতনে-কেতনে সজ্জিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। সুযোধন পাণ্ডবগণকে বনবাসের দুরবস্থার জন্য মনোবেদনা দিবার আশয়ে ঘোষযাত্রায় আসিয়া নিজেই মহালজ্জায় নিপতিত হইলেন। দেখিলেন, দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণ সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। গান্ধর্ব্বযুদ্ধে পাণ্ডবগণ তাঁহারই মত অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। বাস্তবিক, ব্যাসের বন ইন্দ্রপ্রস্থের অনেক ঐশ্বর্য্যে

রিপূর্ণ। ব্যাস ও বাল্মীকিতে যে প্রভেদ, তাহার কিয়দংশ উভয়ের বনপর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

বনে দ্রৌপদী ও সীতা।

ব্যাসের ঐশ্বর্য্যভাসিত বনে দ্রৌপদী শোভা পাইতেন। বাস্তবিক ব্যাসের দ্রৌপদী ও বাল্মীকির সীতায় যে প্রভেদ, তাহা উভয়ের বনবাস-কালে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। বাল্মীকির সীতা, বনবল্লরী কানন-সম্পত্তি; কাননের সুন্দর সরল শোভায় সেই সম্পত্তি যেন অধিক তর শোভিত হইত। সীতা বনে বনে বেড়াইতে যেমন ভালবাসিতেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, বোধ হয়, তত ভালবাসিতেন কি না সন্দেহ। তিনি ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমপদে মনের আনন্দে বিচরণ করিতেন। বনে কত কানন-শোভা বিরচন করিয়া বাস করিতেন। বনবাসে সীতার সুখ, সীতার লীলা ও সীতার সহবাসে রামচন্দ্র সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী কি বনবাসে প্রফুল্লিতা হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তেমনি সুখী করিয়াছিলেন? এক এক দিন দ্রৌপদীর বাক্যবাণে যুধিষ্ঠিরের অটল প্রতিজ্ঞা ও ধৈর্য্য বুঝি বিচ্যুত হইবার উপক্রম হইত। কিন্তু সীতার চিত্ত বনবাসে বন-বল্লরীর ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কানন-সমীরে ঈষৎ হেলিতে ও দুলিতে ভালবাসিত। অযোধ্যার রাজসুখেও সীতা অশোক-বনিকা নামক অন্তঃপুরস্থ উপবন মধ্যে বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। সেই সুখে সীতাকে কুশলে থাকিতে দেখিয়া রাম যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা তিনি সীতাকে কহিলেন; "বৈদেহি! তোমার সন্তান-লাভের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি

কি অভিলাষ কর। তুমি এখন যাহা ইচ্ছা করিবে, আমি তাহ সম্পাদন করিব।" তখন জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামচ কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র! ফলমূলভোজী মুনিঋষিদিগের পবি আশ্রম দর্শন করিতে এবং অন্ততঃ এক রাত্রি তথায় বাস করিয় আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়।"

সীতার অভিলাষ এইরূপ বনবাসের জন্য এক এক বার রা সুখ মধ্যেও ধাবিত হইত। বনে তিনি বনদেবীর মত উল্ল রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বাল্মীকি তাঁহাকে বনবাসে পঞ্চব বনে ও নিজ আশ্রম-কাননে, রাবণালয়ে অশোকবনে, এব অযোধ্যায় অশোককনিকার উপবনে শোভিত করিয়া রাখিয় ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্ত বনে গিয়া যেন দমিয়া গিয়াছিল বনবাসে সীতার চিত্ত প্রসারিত, কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্ত সঙ্কুচি হইয়াছিল। দ্রৌপদী ঐশ্বর্য্য-মাঝে উল্লাসে বল-দর্পে বেড়াইতে অধিকতর ভালবাসিতেন। তাঁহার বনবাস ঐশ্বর্য্য-বিলাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বনবাসে ঐশ্বর্য্য-সুখ মিশাইয়া থাকিতেন দ্রৌপদী ও সীতা উভয়ই যজ্ঞভূমি-সমুৎপন্না প্রবৃত্তিরূপিণী ছিলে বটে; কিন্তু বাল্মীকির সীতা যে ভাবে প্রবৃত্তিরূপিণী, ব্যাসের দ্রৌপদী সে ভাবে প্রবৃত্তিরূপিণী নহেন। সীতা ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের প্রবৃত্তি, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবৃত্তি। পাণ্ডবগণের সহিত দাশরথিগণের যেরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, দ্রৌপদীর সহিত সীতারও সেইরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সীতা এই জন্য বনবাস-কালে অধিকতর রমণীয় বোধ হইয়াছিল। তাঁহার গুণসমূহ বনবাসে অধিক স্ফুরিত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর গুণাবলী বনবাসকালে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

পদী যেন বনবাসের যোগ্য পাত্রী নহেন বলিয়া সেই গুণা-
। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দ্বিগুণ ভাস্বর বোধ হইয়াছিল। ব্যাস
াইলেন, তাঁহার দ্রৌপদী বনবাসে শোভা পাইবার নহেন।
দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ও লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী যখন
র গিয়াছিলেন, বনও তখন ঐশ্বর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।
ার বন, লতা কুসুম ও কর্ণিকার কাননে শোভিত, দ্রৌপদীর
অন্নক্ষেত্রে প্লাবিত, তৈজসে প্রভাসিত, এবং রাজৈশ্বর্য্যের
ধামে পরিপূর্ণ। জটাজূট ও বল্কল-ধারী রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে
ন রক্ষা করিতেন, দ্বারকার ঐশ্বর্য্যরাজ ত্রিভঙ্গ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ
্রৌপদীর বনলজ্জা নিবারণ করিতেন। সীতা চীরধারী রামচন্দ্রের
ক্ত, দ্রৌপদী চূড়াধারী শ্রীকৃষ্ণেরভক্ত। কৃষ্ণ বনমালী-বেশে
ঞ্জবিহারিণী রাধিকার পার্শ্বে শোভা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই
নমালীবেশে আজি বনবাসিনী দ্রৌপদীর পার্শ্বে শোভা পাইলেন
।। ব্যাসের কল্পনায় হরি দ্বারকারাজরূপে দ্রৌপদীর বনে উদয়
ইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বারকায়
ত্যভামার পার্শ্ব ছাড়িয়া একদা দ্রৌপদীর কানন-পার্শ্বে উদয় হইয়া-
ছিলেন। দ্বারকায় দেখি সত্যভামা, বনে দেখি দ্রৌপদী।
অযোধ্যায় সীতা,— দ্বারকায় রুক্মিণী ও বনের রাধিকা। রামচন্দ্র
কুঞ্জবিহারী শ্যামরূপে সীতাকে আবার রাধা রূপে পাইয়াছিলেন।
বনে সীতার সৌন্দর্য্য যেমন অধিকতর প্রস্ফুটিত দেখি, নিকুঞ্জে
রাধার সৌন্দর্য্য বনমালী পার্শ্বে তেমনই মনোহর বোধ হয়। বনের
শোভা বনমালী, বনের শোভা চীরধারী রামচন্দ্র। পঞ্চবটীর শোভা
সীতা; কুঞ্জবনের শোভা রাধাসুন্দরী!

কাব্য——ইতিহাসে।

ইতিহাসের প্রকৃতি।

ইংরাজী ভাষায় যাহাকে History বলে, এক্ষণে ইতিহা শব্দ সচরাচর সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ History শব্দে মূল বিষয়—প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাচীন কালে বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া ইতিহাসবেত্তাগণ প্রায় রাজবৃত্তান্ত লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। নৃপতিগণের ক্রিয়াকলাপ, সন্ধি-বিগ্রহ ও বংশা বলীর যথাযথ বিবরণ দেওয়া ইতিহাসের প্রধান বিষয় ছিল। রাজকীয় ঘটনাবলীর প্রকৃত তথ্য ও প্রকৃত কাল-নির্ণয় করিতে পারিলে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্বে ঘটনাবলীর সন তারিখ এবং প্রকৃত বিবরণ লইয়া ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। ঘটনা বলী প্রকৃত হইলেও তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ নির্ণয় করা এবং সেই ঘটনাবলীর সমুদায় কারণ নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আজি যাহা ঘটিয়া যাইতেছে, তাহারই প্রকৃত বিবরণ বাহির করা যখন দুষ্কর হয়, তাহারই সমস্ত তত্ত্ব ও কারণ নির্দ্ধারণ করা যখন এক প্রকার অসাধ্য হয়, তখন প্রাচীন কালের রাজকীয় ঘটনাবলীর বিবরণ ও রহস্যোদ্ভেদ করা যে আরও দুঃসাধ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? তুমি স্বচক্ষে দেখিলে, একজন মনুষ্য নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু যাই তাহার কারণানুসন্ধান ও সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য অনুসন্ধান

কে যাইলে, অমনি তুমি তাহার নানাপ্রকার বিবরণ ও কারণ তে পাইবে। কোন্‌টী প্রকৃত কারণ, বা কোন্ বিবরণ সত্য া সপ্রমাণ করা বড় সহজ কথা নয়। এই বর্ত্তমানকালে লে যুদ্ধ হইয়া গেল, আমরা শুনিতে পাইলাম। কিন্তু সেই প্রকৃত ঘটনা হইলেও তৎসম্পর্কীয় সমুদায় বিবরণও যে সত্য বে, এমত কোন কথা নয়। সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ নিতে পাইয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক কথা হয় ত প্রকৃত নহে। ধ্যে অনেক কথা হয় ত প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নেক সত্য কথা প্রকাশ করিবার হয় ত যো ছিল না। তন্মধ্যে নিক কথা হয় ত অপযশ ও লজ্জার কারণ ছিল বলিয়া গোপন া হইয়াছিল। যাহারা মরিয়া গিয়াছে, তাহারা কিছু বাঁচিয়া ঠিয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতে আসিতেছেনা, সুতরাং যাহা ল শুনায়, তাহাদের সম্বন্ধে এমত কথা প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত য়াছিল। এইরূপ অনেক কারণে ইতিহাসে প্রকৃত বিবরণ াপন করা হয়। যাহা সে দিন ঘটিল, তৎসম্বন্ধে যখন এতদূর থ্যা কথা রটনা করা সম্ভব হয়, তখন বহু পূর্ব্বকালের ঘটনা-লী যে আরও অধিক মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ হইবে, তাহা আর িচিত্র কি? পূর্ব্বকালের এক একটী ঘটনা এত মিথ্যা জল্পনায় মে ক্রমে আবৃত হইয়া পড়ে যে, অবশেষে সেই ঘটনার প্রতিই ন্দেহ উপস্থিত হয়। সে ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়া ছিল কি না, বিষয়েও একদিন তর্কের কথা হইয়া পড়ে। কারণ, যে বিব-ণ জনসমাজে প্রচারিত থাকে, তাহা প্রায়ই মিথ্যা কথায় এবং না কল্পিত গল্পে পরিপূর্ণ। প্রকৃত রাজমন্ত্রণা গুহ্য রাখিবার ন্য বাহিরে মিথ্যা রটনা করা একটী রাজকৌশল বলিয়া অনেক

সময় গণ্য হয়। ইতিহাস যতই পুরাতন হইয়া আইসে, তাহাতে ততই মিথ্যা কল্পনা, ও মিথ্যা অনুমান প্রবেশ-লাভ করে। কথা মুখে মুখে, ও বংশ-পরম্পরায় পল্লবিত হইয়া পড়ে। অবশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ইতিহাস এত মিথ্যা কল্পনা পরিপূর্ণ যে, তন্মধ্যে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইতিহাস শেষে অনুমান-মূলক হইয়া পড়ে এমত কি, সন তারিখ পর্য্যন্ত ভেস্তিয়া যায়। সুতরাং অবশেষে এমত হয় যে, মূল ঘটনা-সকলও সন্দেহ-স্থল হইয়া পড়ে।

শুদ্ধ রাজবংশীয়গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইতিহাসের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাতে ঐতিহাসিকগণ আপনাদিগের কার্য্য-ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঘটনার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজকীয় ব্যবস্থাবলির কারণ ও উদ্দেশ্য, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক সময়ে অনেক তত্ত্ব-নির্ণয়ে বিলক্ষণ সহায়তাও পাইলেন। দেখিলেন এক একটী ঘটনার কারণ অসংখ্য, এবং ঘটনা সকল অনন্ত-কারণের ফল। ঘটনাসকল এমত গূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, একের তত্ত্ব-নির্ণয় করিতে গেলে, চারিদিক হইতে তাহার অনন্ত সূত্র দেখা দেয়। সুতরাং একটী ঘটনা বুঝিতে গেলে, সেই ঘটনা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ—দেশ, কাল ও পাত্রগণের বিবরণ—জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। শুদ্ধ রাজনীতি বা রাজবিবরণ জানিতে পারিলে কিছুই জানা যায় না। তাও যদি জানা যাইত, তাহা হইলেও যাহা হইক। যাহা রাজনীতি ও রাজবিবরণ বলিয়া

প্রচারিত, তাহা হয় ত প্রকৃত বিবরণ নহে। প্রকৃত রাজনীতি, রাজমন্ত্রণা, ও রাজ-কৌশল জানা এক প্রকার অসাধ্য। রাজনীতির প্রধান নিয়মই মন্ত্রগুপ্তি। যখন একজন সামান্য লোকের ঘরের কথা প্রকাশ হয় না, তখন রাজার মনের কথা, ও রাজসংসারের গূঢ়মন্ত্রনা কিরূপে সাধারণ জনগণ জানিতে পারিবে? বহুকাল পরে একজন ইতিহাসবেত্তাই বা তাহা কিরূপে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন? সুতরাং কোন ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গেলে রাজদিক্ হইতে তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার আলোক লাভ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া যায়। রাজাদের দিক্ হইতে আলোকলাভ করা যখন অসাধ্য হইল, তখন সেই আলোক অন্যদিক্ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আলোকলাভ করিবার জন্য শেষে ইতিহাসবেত্তাগণের এই কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহারা দেশের ও কালের সমুদায় বিবরণ অন্বেষণ করিতে গেলেন। ইতিহাস এখন শুদ্ধ রাজ-বৃত্তান্ত নয়, তাহা একটী দেশের অথবা সমাজের কোন বিশেষ কালের সমুদায় বৃত্তান্ত।

ঐতিহাসিকগণ সমগ্র পৃথিবীর সমুদায় কালের বিবরণ দিতে তত সাহসী হইতে পারিলেন না। কিরূপে পারিবেন? যখন এক বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা এত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তখন সে ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে গেলে ত আরও নৈরাশ্যে পড়িতে হইবে। ইতিহাসের ক্ষেত্র যত সংকীর্ণ করা যায়, যতই বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনায় আবদ্ধ থাকা যায়, তত্ত্বনির্ণয় সম্বন্ধে বরং ততই সুবিধা ঘটিতে পারে। এই জন্য আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ আর বড় সমগ্রপৃথিবীর ও সমস্ত কালের

বিবরণ লিখিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। এক্ষণে, ইতিহাসবেত্তাগণের অনুসন্ধান-ক্ষেত্র বিশেষ জনসমাজে ও বিশেষ কালে আবদ্ধ হইয়াছে। কাল-বিশেষে আবদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু সেই কালের প্রচুর অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা সেই বিশেষ কালের বিশেষ জন সমাজের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নিজ নিজ ইতিহা পরিপূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে ইতিহাসের ক্ষেত্র একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি বিস্তীর্ণ হইয়াছে এক্ষণে প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তাগণ যেমন বহুকালের বিবরণ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তেমনি তাঁহারা চারিদিক হইতে এক বিশেষ কালের বা বিশেষ-সমাজের প্রতি আলোকপাত করিয়া তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। আধুনিক প্রধান প্রধান ইতিহাসে আমরা এই চিত্র দেখিতে পাই। মেকলে, কার্লাইল, ফ্রাউড, গ্রীন প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ এই সরণি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁরা ইতিহাস-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন। ইতিহাস এক্ষণে শুদ্ধ রাজ-বিবরণ নহে, তাহা বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সমুদায় বিবরণ। তাহা আংশিক বিবরণ নহে, তাহা পূর্ণ বিবরণ। ইতিহাস এক্ষণে নীরস যুদ্ধ ও ঘটনার বিবরণ নহে, তাহা সমাজ-বিশেষের, বিশেষ-কালের দেদীপ্যমান চিত্র।

ইতিহাসে কল্পনা।

চিত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই উপাদান দিয়া ইতিহাস এক্ষণে রচিত হইতেছে। বিবরণ সমুদায় এরূপে সজ্জিত হয়, যদ্দ্বারা

টী চিত্রফলক প্রস্তুত হয়। দেশ ও কাল-বিশেষের আচার হার, রীতি, নীতি, রাজবংশ ও প্রজাকুলের বিবরণ এবং াজিক ও পরিবারিক ব্যবস্থা ও নিয়ম, গঠন ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ং বিশেষ জাতির বিশেষ প্রকার প্রকৃতি ও মানসিক ভাব ঃ প্রবণতা প্রভৃতি যাহা কিছু জাতি ও কাল বিশেষের পূর্ণ রিচায়ক হইতে পারে, তাহা ইতিহাসের উপকরণ মধ্যে ধর্ত্তব্য য়া অপূর্ব্ব কৌশলে এরূপে বিন্যস্ত ও চিত্রিত হয় যে, পাঠকের ন তাহার অনুরূপ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই ঐতিহাসিক ত্রে কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যে শক্তিদ্বারা ত্র অঙ্কিত ও সজ্জিত করা যায়, সেই কল্পনাশক্তি ইতিহাস-ক্ষেত্রে রমণ করিয়া শেষে বর্ণগৌরব ও রঞ্জন দিয়া চিত্র-ফলককে র্বাঙ্গ সুন্দর করে। যে স্থলে যে উপকরণ ও কৌশল প্রয়োগ রিলে চিত্রের শোভা এবং পরিস্ফুটতা হয়, কল্পনা তাহা দিতে টি করে না। ইতিহাসে কল্পনার কার্য্য এইরূপ বিস্তারিত প্রশস্ত। কল্পনা যে ইতিহাস-ক্ষেত্রে কুত্রাপি স্থল পাইবে, পূর্ব্বে মত বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা হিলে কিছুই গড়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইতি-াসই কল্পনার বিস্তারিত ক্ষেত্র। ফ্রাউড ও মেকলের কল্পনা ংরাজজাতির ইতিহাসে, এবং গিবনের কল্পনা রোমজাতির ইতি-াসে একবারে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। যিনি যে বৃত্তান্ত খন বর্ণন করিতেছেন, তখন তিনি যেন তাহাকে জীবিত চিত্রবৎ করিয়া দেখাইতেছেন। প্রকৃত ও নীরস ইতিহাসের স্থলে আমরা যেন একটী বর্ণোদ্ভাসিত কাল্পনিক চিত্র পাইলাম। অন্তরে একটী দৃশ্যফলক অঙ্কিত হইল। মনে মনে ভাব সকল

গ্রথিত হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম না, কাব্য কি ইতিহ
পড়িলাম।

ইতিহাসে দর্শন।

আধুনিক ইতিহাসে কল্পনার ক্রীড়া যেমন বিস্তারিত, দার্শনি
চিন্তার ক্ষেত্রও তেমনি প্রসারিত। দর্শন চিন্তা করিতেছে, চি
করিয়া কার্য্য-কারণের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে, কল্পনা সেই স
চিন্তোপকরণ আনিয়া দিতেছে, যে দিকে যাহা পাইতেছে, ত
চিন্তার কাছে আনিয়া দিতেছে। শুদ্ধ আনিয়া দিয়া ক্ষ
নহে, দর্শন যখন তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা ও বিচ
করিলেন, এবং বিচার করিয়া কার্য্য কারণ ও পরস্পরের সম্ব
নির্ণয় এবং স্থাপন করিয়া দিলেন, কল্পনা সেই সমস্ত চিন্ত
সম্ভূত রত্নরাজি পাইয়া তাহাদিগকে গ্রন্থ মধ্যে এরূপে গ্রথি
করিতে বসিলেন, যে সেই নীরস দার্শনিক তত্ত্ব সমুদায় কাব্যে
উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত হইল। দর্শনকে মূর্ত্তিমান করা, চিন্তাকে
সরস করা, এবং ঐতিহাসিক তথ্যকে কাব্যাকারে পরিদৃশ্যমা
করা কল্পনার কার্য্য। কল্পনা দর্শনকে কবিত্বে পরিণত করে
ইতিহাসে কল্পনার সামগ্রী যত, চিন্তার সমগ্রী বোধ হয় ততো
ধিক। কিন্তু যে স্থলে চিন্তা শুদ্ধ নীরস চিন্তা রূপে প্রদর্শি
হয়, সে স্থলে আমরা শুদ্ধ দর্শনকে দেখি। ইতিহাস দর্শন
নহে, ইতিহাস কল্পনা-রঞ্জিত-দর্শন। ইতিহাসের বিষয়-সমুদা
চিন্তা ও দর্শনের সামগ্রী বটে, কিন্তু ইতিহাস দর্শন ও চিন্তাতেই
শেষ নহে। দর্শন ও চিন্তা যাহার প্রারম্ভ করে, কল্পনা তাহার
শেষ করিয়া দেয়। দর্শন ও চিন্তা ইতিহাসের যে সমস্ত সামগ্রী

,, কল্পনা তাহাদিগকে সজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া সুন্দর
ে অঙ্কিত করে। চিন্তায় ভাব-সকল সম্ভূত হয়, কল্পনা
াদিগের রেখাপাত করে। শুদ্ধ রেখাপাত নয়, অপূর্ব্ব-
শলে অপূর্ব্ব রঞ্জনে এবং বর্ণগৌরবে চমৎকার চিত্রফলক
কিয়া দেয়।

আদর্শ ইতিহাস।

ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, এবং এক্ষণে আমরা ইতি-
স বলিতে যাহা বুঝি,তাহার আধুনিক পরিণাম কিরূপ হইয়াছে,
মরা তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ
রূপ, তাহা মেকলে কেমন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন দেখুন :—
History, at least in its state of ideal perfection, is a
mpound of poetry and philosophy. It impresses gene-
l truths on the mind by a vivid representation of parti-
ılar character and incidents. But, in fact, the two
ostile elements of which it consists have never been
nown to form a perfect amalgamation ; and at length,
our own time, they have been completely and
rofessedly separated. Good histories, in the proper
ense of the term, we have not. But we have good his-
orical romance, and good historical essays. The
magination and the Reason, if we may use a legal meta-
hor, have made partition of a province of literature of
vhich they were formerly seized *per my et per tout ;*

and now they hold their respective portions in severa
instead of holding the whole in common.

To make the past present, to bring the distant ne
to place us in the society of a great man or on the en
nence which overlooks the field of a mighty battle,
invest with the reality of human flesh and blood bein
whom we are too much inclined to consider as person
fied qualities in an allegory, to call up our ancesto
before us with all their peculiarities of language, manne
and garb, to show us over their houses, to seat us
their tables, to rummage their old fashion-wardrobes,
explain the uses of their wonderous furniture, these par
of the duty which properly belongs to the historian, hav
been appropriated by the historical novelist. On th
other hand, to extract the philosophy of history, to dire
our judgment of events and men, to trace the connectio
of causes and effects, and to draw from the occurrence
of former times general lessons of morality and politica
wisdom, has become the business of a dfstinct class o
writers.

ইতিহাসের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, মেকলে তাহ
সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসের চর-

See Macaulay's Essay on Hallam's Canstitutional
History.

কর্ষ ও সম্পূর্ণ অবস্থায় তাহা একাধারে কাব্য ও দর্শন। াসের কাব্যাংশ কল্পনার সৃষ্টি। ইতিহাসে সেই কল্পনা ও চিন্তার য মেকলে একে একে অতি পরিষ্কার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হাসে কল্পনার কার্য্য কি? অতীতকে বর্ত্তমান করা, কে নিকটবর্ত্তী করা, মহাজনগণের সহবাস-সুখে সম্ভোগী ,অথবা কোন মহাযুদ্ধের উপক্রমী উচ্চরসে আমাদিগকে ালিত করা, অলৌকিক গুণ-ভূষিত ও মায়াময় রূপকসৃষ্টি-ত মহাত্মাগণকে রক্তমাংসময় দেহীরূপে মূর্ত্তিমান করা ও পুরুষগণ যেন সশরীরে আমাদিগের সমক্ষে বিচরণ ও কথা য়া বেড়াইতেছেন এরূপে তাহাদিগকে পরিদৃশ্যমান করা, ত-পক্ষে ইতিহাসের কার্য্য। অন্যদিকে আমরা দেখিতে ই, সেই ইতিহাস চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া পুরাবৃত্ত সমু-য়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বাহির করিতেছে, ঘটনা ও মানব-িত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নানা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা-গের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা পরস্পর-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে, এবং অতীত ঘটনাবলির রোদ্ধার-স্বরূপ নানা নৈতিক তত্ত্ব ও রাজধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য লন করিতেছে। যিনি এইরূপে কল্পনাসৃষ্টি ও চিন্তার কার্য্য কত্র মিশাইয়া পুরাবৃত্ত রচনা করিতে পারেন, তাঁহারই রাবৃত্ত প্রকৃত-পক্ষে ইতিহাস নামের যোগ্য। তিনিই যথার্থ রোধী ধর্ম্মাক্রান্ত কাব্য ও দর্শনকে একাধারে মিলাইতে ারিয়াছেন। যে ইতিহাসে এই মিলন-সংঘটন হইয়াছে, সেই তিহাসই আদর্শ ইতিহাস। আদর্শ ইতিহাসে সুদ্ধ যে পুরা-ালের ঘটনাবলী ও পাত্রগণের চরিত্র জীবিত বর্ণে চিত্রিত হয়

এমত নহে, সেই ভাস্বর ও জীবিত চিত্রের ফল-স্বরূপ নানা
নিগূঢ় উপদেশ ও সারতত্ত্ব অন্তরে চিরঅঙ্কিত হইয়া যায়।

ইংরাজী ইতিহাসবেত্তা মেকলে আদর্শ ইতিহাসের যে ব্যা
দিয়াছেন, যে আদর্শ ইতিহাস আজিও ইতিহাসপূর্ণ, ইউরো
খণ্ডে একখানিও লিখিত হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করি
ছেন, ভারত ঋষিগণের বড় গৌরবের বিষয়, তাঁহারা শুদ্ধ
সেই আদর্শ ইতিহাসের যাথার্থ্য অনুমান করিয়াছিলেন এ
নহে, সেই অনুমানের ফল-স্বরূপ দুইখানি উৎকৃষ্ট আদর্শ-ই
হাস লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, মেকলে যাহাকে ইতিহা
চরমোৎকর্ষ Ideal State বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা শু
আনুমানিক নহে, তাহা বাস্তব পদার্থে পরিণত করা যাই
পারে। সেই দুই গৌরবের সামগ্রী, সেই দুই আদর্শ-দর্পি
ইতিহাস—অমর রামায়ণ ও মহাভারত। ইউরোপীয় ইতিহা
বেত্তা আজি যাহা আদর্শ ইতিহাস বলিয়া স্থির করিতেছেন, কা
সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে তাহা স্থির হইয়াছিল, তাহ
ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্য্য এই, মেকলের আদর্শ ইতিহাস-ব্যাখ্য
প্রতি পংক্তি মহাভারতে প্রতীতি হইতেছে। কি তাহ
কাব্যাংশ, কি তাহার দার্শনিকাংশ, যে অংশই দেখুন না কে
দেখিতে পাইবেন, মহাভারত সর্ব্বাংশেই মেকলে-নির্দ্দিষ্ট আদ
ইতিহাসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ অথব
শ্রবণ করিয়া আমরা কি ফল লাভ করি? সহস্র সহস্র বৎস
পূর্ব্বে ব্যাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজিও আমরা তাহ
প্রত্যক্ষবৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। কালের ও স্থানের দূরত
আমাদের মানস-চক্ষু হইতে অপনীত হইয়াছে। সকলই আমা-

র সমক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ
মাদের সমক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের
াযুদ্ধ আমরা সমুদায় দেদীপ্যমান দেখিতেছি। যে সমস্ত রসো-
য় সেই সেই যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল, সেই সমুদায় রসে
াজিও আমরা ভাসিতেছি। সেই উচ্চ রসের শিখরে উঠিয়া
ামরাও মহা যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি। ভীষ্মাদি মহাজন-
ণের সহবাস-সুখে সুখী হইতেছি। আমাদিগের নিকট অতীত
কছুই নাই। সেই প্রাচীন সমাজের সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বভাব
ামরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। তখনকার রীতি-নীতি, আচার-
্যবহার, ভাব-ভঙ্গি, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদায় বিষয় আনু-
ুর্ব্বিক আমরা জানিতে পারিয়াছি। এতদূর জানি, যে বোধ
য়, এক্ষণকার বর্ত্তমান সমাজের বিষয় ততদূর জানি কি না
ন্দেহ। যুধিষ্ঠিরাদি পাত্রগণ কি প্রকৃতই জীবিত লোকের
চিত্র, কি কাল্পনিক রূপকময় চিত্র, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি
া। আবার ওদিকে ব্যাসের অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের কি সীমা
করিয়া উঠিতে পারা যায়! তাঁহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, গভীরতা
ও প্রসারতা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইউ-
রোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে যাইতে এক দিন লোকের সাহস
হইতে পারে, কিন্তু অতুলনীয় ও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসের পাণ্ডিত্যের কাছে
যাইতে একেবারে নিরাশ হইতে হয়। এক দিন আমরা দেব-
তার দিকে চাহিতে পারি, কিন্তু ব্যাসের দিকে চাহিতেও সাহস
হয় না। যদি সর্ব্বজ্ঞতা কেবল মুখের কথা না হয়, তবে ব্যাসই
তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ভূত-
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। তিনি কালত্রয়ের ফলা-

ফল ও গূঢ় রহস্য লোকলোচনের সমক্ষে চিত্রবৎ প্রকাশ কর্ দিতেছেন। তাঁহার ত্রিকালজ্ঞতার বিস্তীর্ণ চিন্তাক্ষেত্র বি উর্ব্বর মহাভারত। তাঁহার চিন্তার প্রসার ও দার্শনিক তত্ত্ব গভীরতা দেখিলে ঠিক স্থির করিতে পারি না, তাঁহাকে একজ মহা দার্শনিক বলিব, না, কবি বলিব,। নিখিল বেদ, বেদা ও দর্শনের সমুদায় তত্ত্ব আলোড়ন করিয়া তিনি যে সারোদ্ধা করিয়াছেন, তাহা অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া চিরদিনের জ বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে।

ইতিহাসের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ।

বর্ত্তমান যুগে মেকলে প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণ যাহা স্থি করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। ইতি হাসের লক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে মেকলে সংক্ষেপে বলিয়াছেন:— "It impresses general truths on the mind by a vivid re presentation of particular character and incidents. T extract the philosophy of history, to direct our judgmen of events and men, to trace the connection of causes anc efects, and to draw from the occurrences of formei times general lessons of moral and political wisdom has become the business of a distinct class of writers." এতদপেক্ষা ইতিহাসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আর অধিকতর বিশদ হইতে পারে না। মেকলে যাহাকে General truths এবং General lessons of moral and polifical wisdom বলিয়া ইতিহাসের লক্ষ্যরূপে বিবৃত করিয়াছেন, আমাদিগেরও ঋষিগণ

তাহাই করিয়াছিলেন। এই দেখুন, ইতিহাসের প্রতিপাদ্য লক্ষণ কেমন স্পষ্টরূপে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে॥"

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত পুরাবৃত্তের নাম ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয় পুরাবৃত্ত এবং তাহার লক্ষ্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বিষয়ক উপদেশ। নিজ মহাভারত মধ্যে আমরা ইতিহাসের এইরূপ উদ্দেশ্য দেখিতে পাই। মহাভারতও বলিতেছেন সাংসারিক ব্যক্তিগণের অবতারণা করিয়া তাহাদের কর্ম্ম-ফলাফল প্রতিপাদন করা ইতিহাসের লক্ষ্য। মহাভারতের যে অংশে ইতিহাস আছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় নিজে ব্যাসই এইরূপ বলিতেছেন :—

ইতিহাস প্রদীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা।
লোকগর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সম্প্রকাশিতম্॥

"এই ইতিহাস প্রদীপ প্রকাশিত হইয়া লোকের মোহাবরণ অপনয়ন পূর্ব্বক সমুদায় বিশ্ব প্রকাশিত করিয়াছে।"

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দ সৌতিকে মহাভারতীয় ইতিহাস কথা বিবৃত করিতে বলিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ কহিতেছেন:—

"মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে, মহর্ষি বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে, ঋষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়ের নিকট পরিতুষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহা চতুর্ব্বেদের সারাংশে পরিপূর্ণ, এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, নানা শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া যাহা

রচিত, যাহা ব্রহ্মজ্ঞাননিদান, সেই ভারত-ইতিহাস আমরা শ্র
করিতে ইচ্ছা করি।”

ইংরাজী এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সমন্বয়।

সেই ঋষিসমাজও মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়াছিলে
সুতরাং বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমাদের প্রাচীন ঋ
গণ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকেই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্যরূপে স্থি
করিয়াছিলেন। আজি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহা স্থির করি
ছেন, আমাদিগের ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা স্থি
করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের দেহ পুরাবৃত্ত দ্বারা গঠিত হই
কিন্তু সেই দেহীর মুখে সমাজ ও রাজনীতির উপদেশ কীর্ত্তি
হইবে। মহাভারতে ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে। মহাভারতে
সমস্ত দেহ পুরাবৃত্তে রচিত কিন্তু তাহার অনুশাসন ও শান্তি
পর্ব্বরূপ মুখদেশে কেবল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মোক্ষ
প্রতিপাদক উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত জ্ঞানগ
বাক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মহাভারত রচিত হইয়াছে
এজন্য মহাভারতের অন্যতর নাম জয়। যাহা দ্বারা সংসার জ
হয়, যাহা পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের হেতু, সেই গ্রন্থের নাম জয়।

চতুর্ণাং পুরুষার্থাণামপি হেতো জয়োস্ত্রিয়াম্।

যিনি সমগ্র মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উঠিবেন, তাঁহার
মনে সেই পাঠের বা শ্রবণের ফলস্বরূপ সেই গ্রন্থলিখিত বৃহৎ
চিত্র এত জীবিতবর্ণে অঙ্কিত হয় যে, তিনি তৎকালের সমাজকে
প্রত্যক্ষবৎ নেত্র-সমক্ষে জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকেন। এত
দূর জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকেন যে, গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্র ও পাত্রী-

াকে যেন সশরীরে বর্ত্তমান দেখিতে পান। ভারতের বৃহৎ
াপার যেন সম্মুখেই সমস্ত উপস্থিত রহিয়াছে। এই বৃহৎ
াপার সমুদায় মনকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এত
র অধিকার করে, এত অসংখ্য বিষয় মনে একেবারে প্রবেশ
ত করে যে, মনের সমস্ত ধারণাশক্তিও অভিভূতপ্রায় হইয়া
য়। সেই সমস্ত বিষয় ধারণা করিতে যখন মনে স্থান হয় না,
খন কিরূপে তাহাদিগকে মন আয়ত্ত করিবে। যদি আয়ত্ত করিতে
। পারে, তবে পর্য্যালোচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং
াহাদের ধারণাতেই মন এত অধিকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়ে
য, তাহাদের গুণাগুণ দেখিতে বা বিচার করিতে আর অবকাশ
টে না। শ্রোতা বা পাঠকের মনে মহাভারতের ঐতিহাসিক
ণ যত অঙ্কিত হয়,তাহার কাব্যগুণ তত প্রকাশ হইতে পায় না।
াঠ বা শ্রবণফলের চিত্রাঙ্কন হৃদয়ে সর্ব্বদাই সমুদিত থাকে।
ন কাব্যগুণ দেখিতে ভুলিয়া যায়। এজন্য আমরা দেখিতে পাই
য, যে ঋষিগণ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা
হাভারতকে ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লোমহর্ষণ
ত্র সৌতি যখন নৈমিষারণ্যে ঋষি-সমাজে আসিয়া উপস্থিত
ইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া বলিলেন ঃ—
ভগবন্, বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুধীগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ
াহা শ্রবন করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন
র্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা
সই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি।"

এই ঋষিসমাজ মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া অভিহিত
রিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে শ্রোতার নিকট ইহার ঐতিহাসিক গুণ

এত বিশদবরণে প্রতীত হয় যে, নিজে ব্রহ্মা ইহাকে কাব
বলিতে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। ব্যাস যখন নিজ প্রণী
গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, ব্রহ্মা তখন যেন তাহাকে
কাব্য বলিতে একটু কিন্তু করিয়াছিলেন। ব্যাস ব্রহ্মাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—"ভগবন্, আমি এক অদ্ভুত কা
রচনা করিয়াছি" ব্রহ্মা কহিলেন—"তুমি জন্মাবধি সত্য ব্যবহা
করিয়া থাক এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ
করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলি
নির্দ্দেশ করিলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণি
ও প্রখ্যাত হইবে।"

এস্থলে দেখা যায়, ব্যাস কাব্য বলিয়াছেন বলিয়াই যে
ব্রহ্মা কাব্য নামে মহাভারতকে আখ্যাত করিলেন, নহিলে কে
তিনি তাহাকে আর কিছু বলিতেন। বাস্তবিক, ব্রহ্মা বিলক্ষ
জানিতেন যে, সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের মনে মহাভারতে
ঐতিহাসিক গুণ এত অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, তাহারা ইহাকে
সচরাচর ইতিহাস বলিয়াই গণ্য করিবে। মহাভারতে কাব্য-গু
প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও সাধারণ লোকলোচনের সহজে তাহ
উপলব্ধি হইবে না। এজন্য ব্রহ্মাও তাহাকে একটু সঙ্কুচিত ভাবে
কাব্য বলিয়া গিয়াছেন।

সঙ্কুচিতভাবে কাব্য বলিবারই কথা। কারণ, যদিও তাহ
কাব্য হয়, তথাপি তাহার মুগ্ধকর ঐতিহাসিক গুণ ভেদ করি
কাব্যগুণ মধ্যে প্রবেশ-লাভ করা বড় সহজ কথা নয়। তাহা
সমস্ত শরীর ঐতিহাসিক আবরণে আচ্ছাদিত। সেই আবরণ তুলিলে
তবে তাহার কাব্যরস-ভাবিত সৃষ্টি সকল দেখিতে পাইবে

আবরণ সহজে লোক-লোচন হইতে মুক্ত হয় না। যাঁহারা
ব্যকে ইতিহাস হইতে প্রভেদ করিতে জানেন, সেই জ্ঞানিগণের
ু হইতে যখন সে আবরণ শীঘ্র মুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে,
ন যাহারা কাব্য ও ইতিহসের ভিন্নতা করিতে জানে না,
হাদের চক্ষু হইতে সে আবরণ মুক্ত হওয়া কি রূপে সম্ভব?
রন্ত, মহাভারতীয় চিত্র সকল এত পরিপাটী ও ভাস্বর যে, যিনি
হা দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহা সমুদায় জীবিত ভাবে বর্ত্ত-
ন দেখিয়াছেন। তাহাতে এত লোকচরিত্রের সমাবেশ, এত
ও-কারখানা যেন সমগ্র মহাভারত-মধ্যে সমুদায় প্রাচীন সমাজ
দামান রহিয়াছে। এত অগণ্য লোকের সমাবেশ যে, সমুদায়
চীন সমাজ যেন এক স্থানে উদিত হইয়াছে। এত ঘটনা-
াচুর্য্য ও বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ, যেন প্রাচীনকাল হস্তামলক-
ৎ প্রতীয়মান হয়। শত বৎসরের সমাজচিত্র এক গ্রন্থে
থিত ও অঙ্কিত! অথচ চিত্রের গুণপনা এত, যেন সমস্ত
বিতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সমাজের সর্ব্বদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ
ত্রিত করিয়া, শুদ্ধ দেশ নয়, সমগ্র সমাজের সকল পাত্রগণকে
বিত-ভাবে বিদ্যমান করিয়া, এক সমাজ নয়, এই ভারত-
র্ষের নানাদেশের নানা সমাজের যথাযথ চিত্রাঙ্কন প্রদর্শন
রিয়া প্রাচীনকালে সমুদায় হিন্দুসমাজ কিরূপ ছিল, তাহার
মগ্র ও পূর্ণচিত্র ব্যাস মহাভারত-মধ্যে দিয়া গিয়াছেন। সমস্ত
নের এইরূপ পূর্ণ চিত্র আছে বলিয়া ব্যাস তাঁহার গ্রন্থকে মহা-
রত নামে খ্যাত করিয়াছেন। যাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের
মস্ত জ্ঞানের ভরণ হইয়াছে, তাহারই নাম মহাভারত। যিনি এই
হাভারত পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট সেই পাঠ ও শ্রবণ

ফলস্বরূপ মহাভারতকে এক বৃহৎ ইতিহাস বলিয়াই প্রতীতি হয়,—যে ইতিহাস-মধ্যে সমুদায় প্রাচীন আর্য্যসমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

মেকলের আদর্শ ইতিহাসের ব্যাখ্যা যেমন মহাভারতে সম্ভাবিত হইয়াছে, রামায়ণেও তদ্রূপ। আমরা মহাভারতের ঐতিহাসিক গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, রামায়ণ-সম্বন্ধেও তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। বাল্মীকিও রামায়ণকে ঐতিহাসিক গুণে ভূষিত করিতে ক্রটি করেন নাই। বাল্মীকির কালে প্রাচীন আর্য্যসমাজ যেরূপ ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত এবং শৌর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন ছিল, রামায়ণে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাসের প্রতিভা কাব্য-সৃষ্টি বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্ববিধ আচার ব্যবহার ও অপরাপর সমাজচিত্র দিয়া আর্য্যসমাজ মধ্যে যেমন স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে, বাল্মীকির প্রতিভাও তেমনি নিখিল ভারত মধ্যে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট, চিত্রকূট হইতে ঋষ্যমুখ, ঋষ্যমুখ হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বাল্মীকির কল্পনা পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছে। কি লোকালয়ের প্রাচীন আর্য্য সমাজ, কি অরণ্যবাসিগণের পুণ্য আশ্রমপদ, কি দক্ষিণাপথের বনরমণকারী বানর জাতির রাজ্য,* কি রাক্ষসপূর্ণ স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য্যচিত্র, বাল্মীকি সকল প্রাচীন ভারতের কোন আর্য্য বা অনার্য্য সমাজের চিত্রাঙ্কনে ক্রটি করেন নাই। তিনি এই সমস্ত চিত্র দর্পণবৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন প্রাচীন মুনিঋষিগণের আশ্রমসমূহ আমরা যেন কল্পনায় আজি

* ভারতের দক্ষিণ দেশ সমূহ অত্যন্ত বন সঙ্কুল ছিল। যে মানবজাতি তথায় বাস করিত, তাহারা অত্যন্ত বনরমণকারী ছিল বলিয়া বাল্মীকি

ভব করিতেছি। লঙ্কার ধুমধাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যোধ্যার রাজৈশ্বর্য্যের চিত্রপট মনে চিরঅঙ্কিত হইতেছে।

প্রাচীন অযোধ্যার রাজা, রাজপুত্র, রাজমহিষী ও পৌরগণ ন আমাদের নেত্রে আজিও বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। রণ্য দেশের ঋষিসমাজ চিত্রবৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বাস্ত- ক রামায়ণও সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। ই আদর্শ-সম্বন্ধে রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ই তুল্য। উভয়ই র্য্যঋষির অতুলনীয় কীর্ত্তি। এই দুই ইতিহাস ও কাব্য ঋষি- ণের অমূল্য সম্পত্তি। ঋষিগণের যদি আর কিছু সম্পত্তি না কিত, শুদ্ধ এই দুই মহাসম্পত্তি ও কীর্ত্তি লইয়া তাঁহারা জগন্ময় জয় লাভ করিয়া আসিতে পারিতেন।

হাদের নাম বানরজাতি দিয়াছেন। নহিলে রামায়ণের বানরজাতি প্রকৃত ক পশুজাতি নহে। রামায়ণের কোন স্থলে তাহারা পশুরূপে ব্যাখ্যাত হয় ই। তাহাদের সমাজ মনুষ্য-সমাজ ছিল। তাহাদের রাজা ঠিক মনুষ্য-রাজা ল; তাহাদের মন্ত্রণা ও সম্ভাষণ অতি পরিপাটী ছিল। ভিক্ষুকরূপী হনুমানের হত রাম লক্ষ্মণের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহার সম্ভাষণ-বাক্যে ন কি বলিয়াছেন দেখুন :—

"যাহারা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে সুশিক্ষিত নহে, তাহারা কদাচ ইঁহার ন্যায় ইরূপ বাক্য-কথনে সমর্থ হয় না। আর ইনি সমগ্র ব্যাকরণাদি শব্দশাস্ত্র লক্ষণ রূপে বহুবার আলোচনা করিয়াছেন, অন্যথা ঈদৃশ সাধুপদ-প্রয়োগে নই সমর্থ হইতেন না। বিস্তর কথা কহিলেন, তথাচ একটীও অপশব্দ হার মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই।"

এই বানরজাতির রাজ্য-কৌশল এবং আচারাদি আর্য্যনীতি ও আর্য্য- রানুযায়ী ছিল। বালী, সুগ্রীব ও তাঁহার অমাত্যগণ অত্যন্ত ধর্ম্মশীল ও ধু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

মহাকাব্যের পরিচয়।

ভারতকাব্য ও তাহার সূচনা।

মহাভারত ও রামায়ণ আদর্শ ইতিহাসের গুণে কিরূপ ভূষিত তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই দুই মহাগ্রন্থে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যসমাজের পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেই বিবরণ তাহাদের বাহ্যাবয়ব মাত্র। প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি তাহাতে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কাব্য-লিখিত লোকচরিত্র ও ঘটনা-বর্ণনছলেই বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার প্রগাঢ়তায় ও বর্ণগৌরবে কাব্যসৃষ্টি আবরিত হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য মহাভারত ও রামায়ণ সচরাচর ইতিহাসরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার দ্বিবিধ কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। যাঁহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রভেদ বুঝেন না, তাঁহাদের নিকট ঐ গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস ভিন্ন অন্যরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। এই প্রকারলোক সংখ্যাই অধিক, সুতরাং অধিকতর লোকের নিকট মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া গণ্য।

২। যাঁহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রভেদ বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া উহাদের বাহ্যাবয়বরূপ ঐতিহাসিক বিবরণে এত অভিভূত হন, যে উহাদের কাব্যসৃষ্টি দেখা বা বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণ জীবিত-চিত্র-প্রায় এতদূর তাঁহাদের চিত্ত

স্বিকার করে যে, তাঁহারা উহাদিগকে ঐতিহাসিক জীবিত পাত্র পাত্রী ভিন্ন অন্যরূপে সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিহাসিক মোহে চিত্ত এত মুগ্ধ হয় যে, প্রকৃত তত্ত্ব বিচার রিয়া মোহলব্ধ বিশ্বাস অপসারণ করা তত প্রীতিকর বাধ হয় না।

কিন্তু সাধারণ লোকে সচরাচর উহাদিগকে ইতিহাস বলিলেই ক প্রকৃত-পক্ষে ঐ গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস হইয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই দখিয়াছি, সাধারণ লোকে উহাদিগকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া াকে, সেই ভাব ভাবিয়া ব্রহ্মাও একদা সঙ্কুচিত হইয়া মহা-ারতকে কাব্য বলিয়াছিলেন। যাহা প্রকৃত-পক্ষে কাব্যরূপে রিত হইয়াছে, তাহাকে তিনি কাব্য না বলিয়া আর কি লিবেন? তিনি বলিয়া গেলেন, মহাভারত কাব্য বলিয়াই গতে প্রচারিত হইবে। রামায়ণ-সম্বন্ধেও ব্রহ্মা বলিয়া-ছিলেন:—

"হে বাল্মীকি! তুমি নারদকথিত রাম-চরিত্র-কথা যেরূপে বিস্তৃত করিয়া শ্লোকময় কাব্যে বর্ণন করিবে, সেইরূপে সেই কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না।"

ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন-রূপ আখ্যায়িকা দিয়াই ব্যাস, মহাভারত—ইতিহাস কি কাব্য, এই কথার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ভারতকে প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিব-রণ রূপে গ্রহণ করে, সেই জন্য তিনি মহাভারতের আদিতেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস বলিয়া গিয়াছেন, আমি মহাভারতকে কাব্য-রূপেই সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং তাহা কাব্য রূপে গৃহীত ও অধীত হইলেই লোকে তাহার রস-গ্রহণে

সমর্থ হইবেন। নিজে রচয়িতা ব্যাস যখন মহাভারতকে কা বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাকে অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গে তাহার প্রকৃত কল্পনা কখনই অনুভূত হইতে পারে না। যাহা ভাবে কল্পিত, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত অন্যভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার কল্পনা বিপর্য্যস্ত হই পড়িবে, এবং লোকে তাহার প্রকৃত রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন

এক্ষণে কথা এই, মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যসৃষ্টিই কোন্ অংশে এবং উহাদের ইতিহাসই বা কোন্ অংশে? কাব সৃষ্টি উহাদের অভ্যন্তরে, ইতিহাস উহাদের বাহ্যাবয়বে। কাব সৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ। কাব্য-সৃ উহাদের মূলে ও স্কন্ধে, ইতিহাস উহাদের পল্লবে। কাব্য-সৃ উহাদের মূল আখ্যায়িকা-রচনায়, ইতিহাস সেই আখ্যায়িব বর্ণনায়। এই কাব্য-সৃষ্টিমূলক প্রধান আখ্যায়িকাকে স্বত রাখিবার জন্য ব্যাস মহাভারতের আদিতেই তাহা দেখাইয়া দি গিয়াছেন। পাছে লোকে সেই আখ্যায়িকা-ভাগ দেখিত না পায়, পাছে তাঁহার কাব্যসৃষ্টি কোথায় আমরা দেখিতে ন পাই, এজন্য ব্যাস তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন মহাভারতের যে প্রধান আখ্যায়িকা-ভাগে ব্যাস কাব্য-সৃ সমাবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সেই আখ্যায়িকা-ভাগ কি, আমর তাহা ব্যাসেরই নির্দ্দেশ মত দেখাইতেছি।

সেই আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই মহামন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো২মনীষী।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। *

এই মূল মন্ত্র, মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা সংগঠিত রিয়াছে। এই মন্ত্র আমরা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উচ্চারিত হইতে খিতে পাই। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত াছে। সুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই মহাভারতীয় ল ভিত্তি স্থাপিত আছে। ব্যাস সেই ভিত্তির উপর যে মহা- ালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম ভারত-সংহিতা। সেই ভত্তি-মূলক অট্টালিকা নানা ভূষণে ভূষিত হইয়াছে। যেমন াজপ্রাসাদ নানা পারিপার্শ্বিক ভূষণে সজ্জিত থাকে, তাহা ার্শ্ব-কুঞ্জবন, পুষ্পোদ্যান, উপবন, সরোবর, অশ্বালয়, গজালয়, ায়ুধাগার, সৈন্যসমাবেশ, নর্ত্তকালয়, প্রান্তর, রঙ্গভূমি, প্রভৃতি ানা সজ্জায় সজ্জিত থাকে, মহাভারতীয় প্রধান অট্টালিকা-ভাগও দ্রূপ নানা উপন্যাস ও আখ্যানভূষণে সজ্জিত হইয়াছে। ব্যাস সই অট্টালিকা-ভাগকে স্বতন্ত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অট্টালিকা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভারতসংহিতা

যে মূল আখ্যায়িকা ব্যাস সর্ব্ব প্রথমে রচনা করেন, তাহা ভারতসংহিতা নামে স্বতন্ত্রসংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। এই ভারতসংহিতারই ব্যাস বিস্তৃত বৈশম্পায়নোক্ত মহাভারত। বৈশ-ম্পায়ন নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

---

* মহাভারতের সূচনা যেমন এই কয় ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, রামায়ণও তদ্রূপ নারদোক্ত আখ্যানে সূচিত হইয়াছে। গ্রীক মহাকাব্য এবং তদবলম্বিত ইউরোপীয় অপরাপর মহাকাব্যের সূচনারও এইরূপ নিয়ম।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ততোঽধ্যর্দ্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্॥
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌবিভুঃ।
ষষ্টিংশত সহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।
ত্রিংশচ্ছতসহস্রংচ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্॥
পিত্র্যে পঞ্চদশ প্রোক্তং গন্ধর্ব্বেষু চতুর্দ্দশ।
একং শতসহস্রং তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥
নারদোঽশ্রাবয়ৎ দেবান্ অসিতোদেবলঃ পিতৄন্।
গন্ধর্ব্বযক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ॥
অস্মিংস্তু মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্ম্মাত্মা সর্ব্ববেদবিদাংবরঃ॥
বৈশম্পায়নবিপ্রর্ষিঃ শ্রাবয়ামাস পার্থিবম্।
পারীক্ষিতং মহাত্মানং নাম্না তং জনমেজয়ম্॥
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্তেন ভারতস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত॥

মহাভারত আদিপর্ব্ব। ১ম অঃ ১০১-১০৮।

"মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ উপাখ্যান ব্যতিরেকে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে * ভারতসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন পণ্ডিতগণ ইহাকেই মূল মহাভারত বলিয়া থাকেন। অনন্ত তিনি সংক্ষেপে একশত পঞ্চাশৎ শ্লোক দ্বারা পর্ব্ব ও বৃত্তান্ত সমুদায়ের অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভগবা

* উত্তর কাঁণ্ড ব্যতিরেকে বাল্মীকিও প্রথমে রাবণবধ পর্য্যন্ত যে রামায়ণ প্রণয়ন করেন, তাহারও শ্লোক-সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র।

য়ণ এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ পুত্র শুককে
লেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য উপযুক্ত শিষ্যগণকেও
ষয়ে শিক্ষা দিলেন।"

ভারতীয় পুরাণ।

কেবল ব্যাসের পুত্র শুকদেব এবং কতিপয় উপযুক্ত শিষ্য-
আর কেহ এই সমগ্র মূল মহাভারতের অধিকারী হন
। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, সেই মূল সংহিতা যখন
কারী-ভেদে জ্ঞানধর্মসমুন্নত দেবলোক, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব-
কে অংশে অংশে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহা
াখ্যান-সহিত বর্দ্ধিত ও সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। নহিলে সকলে
হার রসজ্ঞ হইতে পারিত না। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন :—

"দ্বৈপায়ন ষষ্টি লক্ষ শ্লোক দ্বারা উপাখ্যান সহিত আর এক
নি বিস্তীর্ণ মহাভারত-সংহিতা প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে ত্রিশ
ক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ
ন্ধর্বলোকে এবং এই মনুষ্য-লোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিত
ইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিতদেবল পিতৃগণকে, শুক
ন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে শ্রবণ করাইয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য
বদবেত্তা ধর্ম্মাত্মা বৈশম্পায়ন এই মনুষ্যলোকে মহাভারত কীর্ত্তন
রেন। সেই বিপ্রর্ষি প্রথমতঃ পরীক্ষিত-তনয় মহাত্মা মহারাজ
নমেজয়কে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিরা শ্রোতৃ-
ভেদে মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্ত্তন করিয়া গিয়া-
ছলেন, কিন্তু মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোক বৈশম্পায়ন কীর্ত্তন
রিয়াছেন।"

মূল সংহিতাকে উপাখ্যান দ্বারা বিস্তৃত করিয়া যে মহাভার মনুষ্যলোকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল, আমরা সে মহাভারত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূল মহাভারত মধ্যেই মূল চ বিংশ সহস্র শ্লোক-সমন্বিত সংহিতা বিদ্যমান আছে। সেই মূ সংহিতায় মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা স্থাপিত হইয়াছে। ব্যা সেই সংহিতাকে কাব্য বলিয়া ব্রহ্মার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন সুতরাং মূল মহাভারতীয় আখ্যায়িকা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কবি-কল্পন সম্ভূত সামগ্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই মূল সংহিতাংশে বিশ্লেষণ করিবার পন্থা মহাভারত মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই অংশ আমরা কিরূপে বাহির করিয়া লইব? সেই সংহিতা বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও লক্ষণ মহাভারত মধ্যে এইরূপ কীর্তি হইয়াছে:—

"দ্বৈপায়নেন যৎপ্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈর্ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বা যদভিপূজিতম্॥
তস্যাখ্যানবরিষ্ঠস্য বিচিত্র পদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থন্যায়যুক্তস্য বেদার্থৈর্ভূষিতস্য চ॥
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্টঃ সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া॥
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্॥"

"ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রবণ করিয়া যাহার পূজা করিয়া থাকেন, যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম রমণীয় উপাখ্যান আছে, যাহ

চিত্র (দ্ব্যর্থবাচক) পদ ও আদি সভাদি বিচিত্র পর্ব্বযুক্ত, যাহা ত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মতা, আত্মতত্ত্ব-প্রতীতির অনুকূল যুক্তিমূলীয় ন্যায় বেদার্থে সমলঙ্কৃত, যাহা পরম পবিত্র, গ্রন্থার্থসংযুক্ত ও পদাদি-ৎপত্তিমতী ভাষায় গ্রথিত, যাহার সহিত শাস্ত্রান্তরের বিরোধ ই, যে প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস বৈশম্পায়ন ভগবান্ দ্বৈপায়নের মক্ষে তদীয় আজ্ঞানুসারে সন্তুষ্টহৃদয়ে রাজা জনমেজয়ের নিকট স্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহাতে চতুর্ব্বেদের অর্থ গ্রথিত াছে, যাহা শ্রবণ করিলে চিত্ত-শুদ্ধি ও শ্রেয়োবৃদ্ধি হয়, অদ্ভুত-ীতি ব্যাসকৃত সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করিতে অভিলাষ ারি।"

ভারতসংহিতার পরিচয় এই স্থলেই শেষ হয় নাই। এই ংহিতা-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ বর্ণিত হয়াছে :—

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্ম্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যক্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্।
দুর্ব্বৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্ উক্তবান্ ভগবানৃষিঃ।

"কর্ম্মফলভোগপ্রতীয়মানস্বরূপ কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৃতি, ভগবান বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা, ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুর্ব্বৃত্ততা, ভগবান্ মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই সমুদায় মহাভারত মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

এই প্রধান কাব্যকল্পনা ভারত-সংহিতার প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। পরে এই সংহিতাংশ নানাবিধ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার

সহিত বিস্তৃত হইয়া শত সহস্র শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই কা
এরূপে রচিত ও বিন্যস্ত যে, ব্যাস তন্মধ্যে পুরাকালের কো
জ্ঞাতব্য বিবরণ সন্নিবেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি সে
সমস্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য স্থানে স্থানে অবসর করি
লইয়াছেন এবং পাত্র ও পাত্রীগণকে এরূপে সজ্জিত করিয়াছে
যে, তাহাদের কার্য্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দিয়া
ছেন। কেবল সাজাইবার জন্য কাব্য এই রূপে ঐতিহাসি
গুণে ভূষিত হইয়াছে। সেই ঐতিহাসিক আবরণে কাব্য-ভা
আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনাচাতুর্য্যে পাত্র ও পাত্রীগ
জীবিতরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে।

কাব্যোপকরণ।

যে যে কথা ও প্রসঙ্গ মহাভারতকাব্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে
তাহা ব্যাস ব্রহ্মার সমক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয় সমু
দায় অসংখ্য। "সমুদায় বেদের ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রের রহস্য;
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিস্, নিরুক্ত ও ছন্দ এই ছয় অঙ্গের
সহিত বেদ ও উপনিষদের বিস্তার; ইতিহাস ও পুরাণের উন্মেষ
ও সংগ্রহ; ত্রিবিধ কাল-নিরূপণ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি,
ভাব, অভাব প্রভৃতির নির্ণয়; বিবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ,
বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য,
পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতির স্থিতি ও পরিমাণ,
যুগ-নিরূপণ, চতুর্ব্বেদ, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, দান-
ধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম, দেবজন্ম ও মনুষ্য-জন্মের বিবরণ; নদী, বন,
পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির নির্ণয়; প্রাচীন যুদ্ধ-কৌশল, ধনুর্বেদ,

হ-রচনা, দুর্গ ও সেনারচনার বিধি; রাজা, অমাত্য, চেট ভৃতি বক্তাভেদে বাক্যভেদ; লোকযাত্রাক্রম, নীতিশাস্ত্র”—ভৃতি যাহা যাহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় সমুদায়ই মহাভারত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। নিখিল সংসার হাভারত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা-বর্ণনায় খন সমস্ত সংসার আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। প্রকৃত সামান্য ঘটনা ব্যাসের লেখনীর যোগ্যও নহে। তাঁহার লেখনীর যোগ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মাণ্ডকে ও ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণকে সম্যক্‌রূপে বিকাশ করিয়া দেখাইবার জন্য মহা-ভারতীয় বিরাট কাব্যের মহা কল্পনার সৃষ্টি। সেই বিরাট মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য নিখিল সংসারের আয়োজন। আয়োজন, সব ক গ্রন্থ মধ্যেই। মহাভারতের বিশাল দেহে সেই দেদীপ্যমান বিরাটমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। যিনি সেই মূর্ত্তি দেখিতে না পান, তিনি মহাভারতের কিছুই দেখেন নাই।

যে মূর্ত্তি বিরচন করিবার জন্য মহাভারতীয় কাব্যসৃষ্টির কল্পনা, মহাভারত সেই মূর্ত্তিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রথমে তাহার যদাভাস, পরে ক্রমশঃ সেই মূর্ত্তি অঙ্গে অঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অবশেষে এত বিস্তারিত ও বিরাট বেশে প্রতীয়মান হইল যে, সমুদায় মানসপুর একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। চিত্ত ময় হইয়া গেল, সমুদায় গ্রন্থ সেই মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

ভারতীয় সংকল্প।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই বিশ্বরূপী ভগবান্‌ নারায়ণকে প্রতীয়মান করাইবার জন্য যে কাব্য-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি

মহাভারত-কথা আরম্ভ করিবার প্রারম্ভেই সঙ্কল্প করিয়া উ
করিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য-সৃষ্টিতে কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বময় জ্ঞা
বিগ্রহ-স্বরূপ পরমাত্মা প্রতীয়মান হইবেন তাহা কথিত হইতেছে:

"বক্ষ্যমান মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যাদি
মহাবৃক্ষ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ; শকুনি তাহার শাখাস্বরূপ; দুঃশা
সমৃদ্ধ ফলপুষ্প স্বরূপ এবং অপরিণাম-দর্শী অমনীষী মহা
ধৃতরাষ্ট্র এই ক্রোধময় মহাবৃক্ষের মূলস্বরূপ।"

এই গেল পাপ-পক্ষ। টীকাকার নীলকণ্ঠ-স্বামী এই পা
পক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া
সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ রূপে মহাভারতে কথি
হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে আমরাও সংসারক্ষেত্রে দেখিতে পাই
এই পাপ প্রবৃত্তি সমুদায় শত আকারে যখন প্রধূমিত হইয়া উ
তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া কার্য্যোন্মুখ হয়, এবং য
তাহা কার্য্যোন্মুখ হয়, তখনই তাহা ক্রোধময় দুর্য্যোধন।
ক্রোধের শান্তি তুমুল সংগ্রাম ব্যতীত কিছুতেই সংঘটিত হয় না
পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে এই রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃ
কার্য্যক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অনিবার্য্যরূপে উদয় হয়, সেই সংগ্রাম
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। লোকে লোকে, জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে
ব্যক্তিতে, রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, এই যু
নিয়ত ঘটিতেছে। যেখানে পাপপক্ষ প্রবল হইয়া ক্রোধরূপে
জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেইখানে এই যুদ্ধ-ব্যাপার অনিবার্য্য। কিছু
তেই তাহার শান্তি নাই। বিনা কুলক্ষয়ে, বিনা রক্তপাতে, বিন
পাপের প্রশমনে ও ধ্বংসে তাহার শান্তি হইবার কোন উপা
নাই। নিজে ব্রহ্মাও সে যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারেন না। এ

চাক্ষ ব্যাপার মহাভারতীয় কল্পনা। মহাভারতীয় কল্পনায় পপক্ষকে এইরূপ সাজাইয়া বেদব্যাস ধর্ম্মপক্ষকে কি রূপ চাইয়াছেন দেখুন :—

"যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ স্বরূপ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ স্বরূপ, ল ও সহদেব সুসমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল স্বরূপ; কৃষ্ণ (পরমাত্মা) ং (বেদ) ব্রাহ্মণগণ (বেদ-উপদেষ্টা) এই ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষের -স্বরূপ।"

যিনি ধর্ম্মযুদ্ধে স্থির থাকিয়া জয়লাভ করেন, তিনিই যুধিষ্ঠির। ম ধৈর্য্যশীল প্রশান্ত ধর্ম্ম-বিগ্রহের কল্পনাই যুধিষ্ঠির। প্রশান্ত বে ধর্ম্ম-যুদ্ধে স্থির থাকিয়া জয়লাভ করিতে গেলে শম, দম, া, অহিংসাদির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই সমস্ত প্রবৃত্তিই যুধিষ্ঠিরের সহায়স্বরূপ ভ্রাতৃগণরূপে কল্পিত হইয়াছে। লকণ্ঠ-স্বামী এই ধর্ম্মপক্ষের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতে গিয়া সেই খাই বলিয়াছেন। সুতরাং মহাভারতের অধ্যাত্মবাদ তাহার কাকারগণের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-ক্ষ উভয়ই বর্ত্তমান। সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহারা দেখা য়। এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে এক দিকে পাপের পক্ষ বল হইয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে মানবের সদ্বৃত্তি সমুদায় ভাবতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। যখন এই বিপরীত ক্ষদ্বয়ের মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনই মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মযুদ্ধের পচয় হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মযুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্রের * যুদ্ধ।

* এই জন্য মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে। েন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বর্দ্ধিত য়া ফলপুষ্পশালী বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, সেই রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বৃদ্ধি ইয়া থাকে। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "কুরুধ্বে দেব যজনম্।"

এই যুদ্ধের এক পক্ষের নায়ক ক্রোধময় দুর্য্যোধন, অ পক্ষে সাত্বিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণরূপে সমুদায় সংগ্রামে নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বেদব্যাস ধর্ম্মরূপী যুধি রূপ মহাবৃক্ষের মূলে কি স্থাপন করিলেন? না—শুদ্ধ সত্ব জ্ঞানবিগ্রহপরমাত্মা রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও বেদাঙ্গ রূপ ব্রহ্ম এবং সেই বেদ-উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ। আমরা মহাভারত গ্রে কোন ব্যাপারে কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরে দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হই এবং বেদ ও শ্রীকৃষ্ণকে সমক্ষে রাখিয়া সকল কার্য্য সমা করিতেন। যে ধর্ম্ম-বিক্রমরূপী অর্জ্জুন সাত্বিক জ্ঞান-রূপী কৃষ্ণে সারথ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, সে বিক্রম ধর্ম্মযুদ্ধে কখন বিজ হইতে পারে না। ভগবান কর্ত্তৃক চালিত না হইলে ধর্ম্মবিক্র কখনই ধর্ম্মকে প্রতিষ্টিত করিতে পারে না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মযু যাহা সংঘটন হয়, মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবিক তাহাই ঘটিয়াছে। ব্যাস মানবহৃদয়কে এইরূপ বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, যিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইতে চাহেন, তিনি যেন সাত্বিক বুদ্ধি দ্বারা সতত নীয়মান হন। সাত্বিক জ্ঞানকে নায়কত্ব না দিলে সংসার-ক্ষেত্রে নিস্তার নাই। পাপপক্ষ অহর্নিশ ষড়যন্ত্র করিয়া মানবকে মহাকলুষ-পঙ্কে ডুবাইতে চাহে। সে ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে হইলে তীক্ষ্ণ সাত্বিকজ্ঞান আবশ্যক। শুদ্ধ সাত্বিকজ্ঞান নহে, তাহা ধর্ম্মবিক্রমে বলীয়ান হওয়া চাই। নর নারায়ণ একত্র সংমিলিত হওয়া চাই। পুরুষত্ব ও সাত্বিক জ্ঞান একত্র কার্য্য করা চাই। তবে সংসার-ক্ষেত্রে জয়লাভের সম্ভাবনা। এই ব্যাপার লইয়া

ভারতের সৃষ্টি। ব্যাস মহাভারতীয় ধর্ম্মপক্ষের কল্পনা রূপে সজ্জিত করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে উজ্জ্বলবর্ণে স্থলে পরিদৃশ্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে কৃষ্ণকে দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি াটাকার ধারণ করিয়াছে। জগৎ-সংসার যেমন নারায়ণের •মহাভারত তেমনি নারায়ণের রূপ। এই জন্য, ব্যাস াড়াতেই বলিয়াছেন, মহাভারতীয় মহা বৃক্ষের

"মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ।"

ভারতীয় কাব্যসৃষ্টি।

মহাভারতের প্রারম্ভেই তাহার কিরূপ কাব্য-পরিচয় আছে াহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। ব্যাসের নিজ মুখের পরিচয় হা, তাহাই দিয়াছি। একথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে । এই কাব্য-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার পাত্র ও পাত্রীগণ যে কৃত ঐতিহাসিক লোক নহেন, তাঁহারা যে কেবল কাব্য-রচিত রিত্র মাত্র, তাহাই যেন বিশেষরূপে পরিচয় দিবার জন্য, ব্যাস াই পাত্র ও পাত্রীগণকে দেবসম্ভব করিয়া অদ্ভুত রূপে সৃষ্টি রিয়াছেন। কি পাণ্ডবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রৌপদী, াহারই জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। তাঁহাদের উৎপত্তি ও জন্ম দ্ভুত। তাঁহারা কেহই সাধারণ মনুষ্যের মত জন্ম গ্রহণ করেন াই। তাঁহাদের অলৌকিক জন্ম-বিবরণ দিয়া ব্যাস তাঁহাদিগকে াব্যের কল্পিত চরিত্র রূপে দেখাইয়াছেন। রামায়ণে যেরূপ শরথিগণের জন্ম অদ্ভুত, মহাভারতীয় কুরু-পাণ্ডবগণের জন্মও রূপ অদ্ভুত। উহারা সকলেই কাব্যের পাত্র ও কাল্পনিক সৃষ্টি।

ঐতিহাসিক জনগণের সহিত উহাদের পার্থক্য এইরূপে প্রথ
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাছে এ সম্বন্ধে পাঠকের ভুল হয়, এ
আদিতেই কবি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মহাভারতে
অনুক্রমণিকা ও আদিপর্ব্বের মাহাত্ম্য এইজন্য এত অধিক।
যাহা হউক, যিনি এইরূপ কাব্যনিদর্শন তুচ্ছ করিয়া ম
ভারতীয় প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণকে প্রকৃত শরীরী ও ঐতিহাসি
লোক-চরিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, সে
চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতিসাধন করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার
কেবল কাব্য-সৃষ্টি-রূপেই তাহাদিগের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এব
আদর্শ চিত্র রূপেই তাহারা কাব্যে সম্ভাবিত হয়। নহিলে প্রকৃ
মানব-শরীরে একাধারে এত দৈবগুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনী
নহে। সেই দৈবগুণে তাঁহারা সকল বাধাবিপত্তির উপর জয়
লাভ করিয়াছেন। পাত্র সম্বন্ধে যাহা সত্য, মহাভারতীয় ঘটনা
সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ
বলিয়াছিলেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

একথা কি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণীকৃত হয়? প
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—একথা কি অক্ষরে
অক্ষরে মহাভারত মধ্যে সপ্রমাণ হইয়াছে? যখন তুমি
কথা ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমাণ করিতে গেলে, তখ
দেখিতে পাইলে, মহাভারতীয় ঘটনায় তাহার কিছুই প্রমাণীকৃ

নাই। তন্ন তন্ন বিচার করিতে গেলে কে না পাপী বলিয়া
্য হয়? এমত কি, যুধিষ্ঠিরকেও পাপ-স্পর্শ করিয়াছিল।
নিও বিরাটগৃহে এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মিথ্যা ব্যবহার করিয়া-
লেন। তাঁহার অসত্য ব্যবহার জন্ত নরক-দর্শন হইয়াছিল।
বে কেন যুধিষ্ঠিরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন না?
দ্রূপ সকল পাপী কি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? না সকল পুণ্য-
নই মুক্তিরূপ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? বাস্তবিক, বিচার্য্য
শোক্তি মহাভারতে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় তিষ্ঠিতে পারে
। কেবল কাব্য-কল্পনায় সে কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়।
াভারত এরূপে কল্পিত ও সজ্জিত, যে তাহাতে ধর্ম্মেরই উদ্ধার
ধন হইয়াছে এবং অধর্ম্মের ধ্বংস হইয়াছে। প্রমাণে একথা
টিবে না, কারণ, কাব্য কোন কথা প্রমাণ করিতে চাহে না।
াব্য ন্যায়শাস্ত্র নহে, কাব্য প্রকৃত ঘটনা এবং ইতিহাসও নহে।
াব্যে প্রমাণ নাই, কিন্তু রসের সঞ্চার আছে। কাব্যে এতদূর
াবের প্রগাঢ়তা জন্মে যে, হৃদয়ে সেই প্রগাঢ়তায় যে সত্য
ংস্কারবৎ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হৃদয়মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত
াকে। মহাভারত-পাঠে সেই ফলের উদয় হয়। মহাভারত
কান সত্য প্রমাণ করে নাই, কিন্তু ঘটনা-যোজনা ও কল্পনার
কৌশলে মনে এরূপ রসের সঞ্চার করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা মন
াদ্র হইয়া যায় এবং সেই আর্দ্র চিত্তে সত্যসকল বদ্ধমূল ও
াজ্বল্যমান হইয়া থাকে। বিচক্ষণ পাঠকের মনে বিলক্ষণ
প্রতীতি হইতে থাকে, কৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন :—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

ব্যাস এত বিশদ রূপে গ্রন্থারম্ভেই যে কাব্য-সৃষ্টির পরি
দিয়াছেন, বাল্মীকিও গ্রন্থারম্ভে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন
রামায়ণের আখ্যানভাগ দেবর্ষি নারদ গ্রন্থসূচনায় বলিয়া গেলেন
এই আখ্যানভাগ কবির কল্পনায় বিজৃম্ভিত হইয়া কি আ
আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা রামায়ণে দেখি
পাই। ব্যাসের সৃষ্টি-রাজ্যে এইরূপ বেদমন্ত্রের একটী সাম
বীজাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইয়া কেমন বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষে পরি
হইয়াছে, আমরা তাহারও পরিচয় দিয়াছি। বাস্তবি
কবির সৃষ্টিকল্পনায় সামান্য বিষয় কত বৃহৎ আকার ধারণ করি
পারে, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গ্রী
মহাকাব্যেও তাহা প্রতীত হয়। কিন্তু কবির অনুভব এত
তন্ন করিয়া সকল বিষয় রচিতে পারে, যেন অনুম
হয়, সে সমুদায় প্রকৃত-পক্ষে ঘটিয়া যাইতেছে। কবি
সৃষ্টি কাল্পনিক জগতে যেন বাস্তবিকতার মোহন ছড়াই
দিয়া সে জগৎকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া দেখায়
বাল্মীকির কল্পনায় এইরূপ কাব্যসৃষ্টির শক্তি বিদ্যমান দেখি
ব্রহ্মা বলিয়া গেলেন :—

"হে ঋষিবর, তুমি নারদের মুখে ধীমান রামের চরিত-বিষয়
যাহা শুনিয়াছ তাহা বর্ণন কর। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও রাক্ষস
গণের বিষয় যাহা তোমার অবিদিত আছে, আমি বলিতেছি
সে সমুদায় তুমি জানিতে পারিবে। রাম, প্রিয়তমা সীতা
জনক দশরথের সহিত কোন্ কোন্ সময়ে কি কি কথা কহিয়া
ছিলেন এবং প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন
তাহা কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না।"

আখ্যান-কাব্য।

বাল্মীকির কল্পনা সে সমুদায় দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। দিব্য চক্ষু যাহার নাই, তিনি কবি নহেন। বাল্মীকি ই দিব্যচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন ্যসত্যই ঘটিয়াছে, এরূপ প্রতীতি হয়। বাল্মীকি যেন সকল য়-সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়া গেলেন। তাঁহার তেজস্বিনী নায় সমুদায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। যাহা লিখিলেন তাহা ব্য লিখিলেন, কি, বাস্তবিক ঘটনার বিবরণ দিলেন, তাহা ক করা দুষ্কর। এই ঐতিহাসিক মোহ রামায়ণের কাব্যসৃষ্টি কিয়া রাখিয়াছে। তাই রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা াবিত হইয়াছে। এই মোহাবরণ রামায়ণে যেমন বিদ্যমান, হাভারতেও তেমনি বিদ্যমান। সেই আখ্যান-কাব্যই উৎকৃষ্ট াব্য, যাহা ইতিহাসরূপে প্রতীত হয়, এবং সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট তিহাস যাহা কাব্যরূপে প্রতীত হয়। অতি উৎকৃষ্ট আখ্যান- াব্য বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে ঐতিহাসিক গুণ বর্ত্তিয়াছে। ইজন্য ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিয়া গিয়াছেন :—

"তুমি বাক্যে রামবিষয়ক যাহা বর্ণন করিবে, তাহার কিছুই মিথ্যা হইবে না।"

"ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।

মহাকাব্যের সত্যতা।

বাস্তবিক, রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, াহার কিছুই মিথ্যা নহে। মানবের অন্তর্জগতে যাহা সত্য াত্যই ঘটিয়া থাকে, এই মহাকাব্যদ্বয়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্জগতে যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রতীতি। রামায়ণে ও

মহাভারতে সেই প্রতীতি সমুদায় সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছে
অধ্যাত্ম জগতের যাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণ তাহা স্থূলরূপে দেখা
এজন্য, রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়া
তাহা সমুদায়ই সত্য। মানবের জীবনক্ষেত্রে এই ধর্ম্মযু
যাথার্থ্য প্রতিদিন প্রতীয়মান হইতেছে। ইতিহাসই মিথ্যা
হইতে পারে, কাব্য আবার মিথ্যা হইবে না, ব্রহ্মার এই উ
আমরা এই রূপেই সত্যজ্ঞান করি।

মহাভারত ও রামায়ণের কাব্যপরিচয়।

মহাভারতকে কাব্য বলিয়া ব্যাসের পরিচয় দিবার কা
আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি বোধ হয় দেখি
থাকিবেন, রামায়ণ কাব্য হইলেও সাধারণ লোকে সচরা
তাহা প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে
কিন্তু তিনি জানিতেন, রামায়ণ এক খানি মহাকাব্য। পা
মহাভারতও সেইরূপে সাধারণগোচর হয়, তজ্জন্য তিনি তাহ
মূলেই বলিয়া গেলেন, এমত কি ব্রহ্মার সমক্ষে বলিয়া গেলে
যে, মহাভারত একখানি মহা কাব্য। নিজ গ্রন্থের এইরূপ স্প
পরিচয় দিয়া তিনি রামায়ণের কলঙ্ক-মোচন জন্য জগতে অধ্যা
রামায়ণের রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতীয় কাব্য পরি
চয়ের এই কারণ-নির্দ্দেশ আমাদের অনুমান মাত্র। আর এক
অনুমান এই, মহাভারতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এত অধিক যে
পাছে তাহার সহিত তাহার কাব্যাংশ ভেস্তিয়া যায়, এজন্য
বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মহাভারতে প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবর
অধিক পরিমাণে থাকিলেও মূলে তাহা কাব্য মাত্র। তাহা

কোন্ অংশ কাব্য এবং তাহাতে কি কি প্রকৃত ও প্রাকৃত বিবরণ আছে, গ্রন্থের অনুক্রমণিকা-ভাগেই তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণে এত বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়া নাই। কারণ, প্রথমে বাল্মীকি, তার পর ব্যাস,—বাল্মীকি সর্ব্বাংশে ব্যাসের পথ-প্রদর্শক। বাল্মীকি অগ্রে নিজ মহাকাব্যের রচনা করিয়া জগতে যে আদর্শ দিয়া গেলেন, ব্যাস তাহার অনুসরণ করিয়া নিজ কাব্য রচনা করিলেন। সুতরাং বাল্মীকির এই নূতন সৃষ্টি-শক্তির যশ ও গৌরব জগতে চিরদিন ঘোষিত হইবে। বাল্মীকির মুখ হইতেই প্রথমে জগতে মহাকাব্য-শ্লোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তাঁহারই কাব্য প্রথমে সঙ্গীত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই কল্পনা হইতে সর্ব্বপ্রথমেই সম্পূর্ণ নিয়ম-নিবদ্ধ-মহাকাব্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। বাল্মীকি শুদ্ধ যে আদি কবি ছিলেন এমত নহে, তিনি আদি কবি হইয়া মহাকাব্যেরও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি শুদ্ধ যে এক নূতন মহাকাব্য-কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল এমত নহে, সেই কল্পনায় যে রূপ বিস্তারিত রচনার কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে রূপ রচনাপ্রাচুর্য্য জগতে অল্পই লক্ষিত হয়। ব্যাস এই রচনাভাণ্ডার আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাল্মীকির সরল ভাষা তাঁহার বিশেষ গুণমাত্র। বাল্মীকির গৌরব, আবিষ্কারে; ব্যাসের গৌরব উন্নতি-সাধনে। ব্যাস মহাকাব্যের রচনাবিস্তৃতিতে এক মহা অন্তর্জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির জগৎকে আরও প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সৃষ্টির উপর সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানরাজ্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির মুখোজ্জ্বল করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা গৌরবের উজ্জ্বল বয়ণে জগতে প্রসারিত করিয়া

গিয়াছেন। জগতের কোন্ কবি এরূপ অন্য কবির অনুসরণ করিয়া বরং তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া গিয়াছেন? এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বাস্তবিক, ব্যাস ও বাল্মীকি জগতের সাহিত্য-দেশে দুই অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

মহাকাব্যের সাদৃশ্য।

ঘটনা ও পাত্রগণের চরিত্র-সাদৃশ্য।

মহাভারতের সহিত রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি ঘটনা, কি পাত্রগণের চরিত্র, উভয়তঃ এই সাদৃশ্য প্রতীয়মান। যাহাদিগের উদ্দেশ্য একই, তাহাদিগের কল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য না থাকিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কই? এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, এই দুই মহাকাব্যে অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে, কেবল সদৃশ ঘটনা কল্পনা করিবার একটু বিভিন্নতা মাত্র। যিনি যেরূপ কবি, তিনি সেইরূপে ঘটনা কল্পনা ও পাত্রগণের চরিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের সাদৃশ্য এত অধিক, যেন বোধ হয়, একজন অন্যের সামগ্রী ও কল্পনা লইয়া নিজ কাব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যেন বাল্মীকির সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামায়ণে রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণিত আছে, তিনি সেই ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উজ্জ্বলতর ও অতুলনীয় রাজসভা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিলেন। রাজভোগের পর একেবারে বনবাস এবং বনবাসে রামচরিত্রের কেমন সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইতেছে! এই বিপরীত দশায় পাণ্ডবগণেকেও দেখাইবার জন্য যেন পাণ্ডবগণের বনবাস কল্পিত হইয়াছে। দাশরথিগণের চরিত্র-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দলে দলে দেখাইবার জন্য বাল্মীকি যেমন রাক্ষস ও রাবণ-পক্ষের কল্পনা করিয়াছেন, তেমনি

মহাভারতে ব্যাস ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কল্পনা করিয়াছেন। রাবণ যে রামলক্ষণের চরিত্র-সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যই মহা মায়াজালে বৈরব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এদিকে দেখা যায়, পঞ্চপাণ্ডবে চরিত্র-সৌন্দর্য্য বিকাশ করিবার জন্যই যেন দুর্য্যোধনাদি যুদ্ধব্যাপার ও শত্রুতাচরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের গু পরম্পরা যাহাতে বিশদবরণে সুরঞ্জিত হয়, দুর্য্যোধন এবং সকল ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পাণ্ডবগণের চরি দেখিতে চাও, তবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কল্পনার দিকে চাহিয় দেখ। যদি পাণ্ডবগণকে বুঝিতে চাও, অগ্রে দুর্য্যোধনকে বুঝ আবার দেখ, রামায়ণে প্রতিজ্ঞা ও সত্য-পালন আছে, মহা ভারতেও তাই। বরং মহাভারতে সেই সত্যপালনের অনে বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যপালনে আবা অজ্ঞাতবাস। সত্যপালনের জন্ম রাজ্যত্যাগ উভয় কাব্য মধ্যে লক্ষিত হয়। দাশরথিগণ যেমন ত্যাগী, পাণ্ডবগণ তদপেক্ষ কিছু ন্যূন নহেন। সীতার বিবাহে যেমন ধনুর্ভঙ্গ-পণ দ্রৌপদীর বিবাহেও তেমনি লক্ষ্যভেদ। দাশরথিগণের ভ্রাতৃ ভাবকে পরাজয় করিবার জন্যই যেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন একা পঞ্চপাণ্ডবগণকে সৃষ্টি করিয়া সেই পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা কল্পনা করিয়াছেন। নহিলে আমরা দেখিতে পাই, এ বিবাহ শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ। কেবল মাতৃ-আদেশের বিশেষ বিধি আনিয়া কবি এই বিবাহ প্রশস্ত করিলেন। * এই বিবাহ

* হিন্দুধর্ম্মে গুরুবাক্য এবং বেদবাক্য এই দ্বিবিধ শাসন ও কর্ত্তব্যনিরূ রণের পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যতদিন লোকের শাস্ত্রাধিকার না জন্মে ততদিন গুরুবাক্যই পালনীয় ও কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। পাণ্ড

নিয়া তিনি দেখাইলেন, পঞ্চপাণ্ডব এমনি একাত্ম ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ ছিলেন যে, যাহাতে সুন্দ উপসুন্দের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা ই ভ্রাতৃগণের বিচ্ছেদের কারণ হয় নাই। তাঁহারা পাঁচজনে ন এক বলিয়া দ্রৌপদীর সতীত্ব প্রথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী ই এক-প্রাণ পাঁচজনে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া সতী। একই ত্মা যেন মহাদেবে পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং সতী সেই পঞ্চমুখ হাদেবে চিরদিন প্রতিষ্ঠিতা। রামায়ণে দাশরথিগণের ও ীতার জন্ম যে রূপে কল্পিত, মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের ও দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত ঠিক তদনুরূপ অভৌতিক ব্যাপার। ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণের জন্মবৃত্তান্ত আরও অদ্ভুত। কর্ণের জন্ম তদপেক্ষা অদ্ভুত। র্ণ হইতে কখন কি সন্তান জন্মে? না সূর্য্যের সহিত সঙ্গম ম্ভবে? শুদ্ধ জন্ম নয়, পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদীর মৃত্যু যেমন দ্ভুত মহাপ্রাস্থনিক ব্যাপার, রাম ও সীতার মৃত্যু তদনুরূপ অদ্ভুত ্যাপার। ঐতিহাসিক পাত্রগণের জন্ম ও মৃত্যু কি এরূপ অভৌতিক ্যাপার হইতে পারে? দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা যেমন পাঞ্চালীকে াপনাদের সেবায় নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, াবণও তদ্রূপ সীতাকে আপন সেবায় নিয়োজিত করিবার ংকল্প করিয়াছিল,—তাহাতেই মহাযুদ্ধের উৎপত্তি। মনুষ্যের প্রবৃত্তি যখন ধর্ম্মসাধনে যত্নবতী হইয়াছে, তখন যদি পাপমতি সই প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতির দিকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে যেমন অন্তর্জগতে মহা ধর্ম্মযুদ্ধ বাধিয়া উঠে, তেমনি যুদ্ধের অনুরূপ

ণের মাতৃআজ্ঞা এবং পরশুরামের পিতৃআজ্ঞা এই কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লৌকিক এবং অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিয়া পুরাণ সকল কথার উপদেশ দেন। অদ্ভুত ষ্টান্ত নহিলে সাধারণ লোকের মনে উপদেশ বদ্ধমূল হয় না। এ কথা "াহিত্য-চিন্তায়" বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কল্পনার ছবি এই মহাকাব্যদ্বয়ে প্রদর্শিত দেখিতে পাওয়া যায়
ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপা দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞক্ষেত্ররূপ কর্ম্মভূমি হইতে
সম্ভূতা, সীতাও তদ্রূপ। সীতার গৌরব বাড়াইবার জন্যই যে
বাল্মীকি তাঁহাকে রাবণ-আলয়ে স্থাপিতা করিয়াছেন। কিন্তু
তাহাতে সীতার চরিত্রে যে লৌকিক অপকলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে
—যে অপকলঙ্কের জন্য সীতা চিরদুঃখিনী, সেই অপকলঙ্ক
নিবারণ জন্য ভারতকার ব্যাস দ্রৌপদীকে দুর্য্যোধন
আবাসে স্থাপিত করেন নাই। ব্যাস নিজ মতে কল্পনাকে
বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন মাত্র। দ্রৌপদীকে চিরদুঃখিনী
সীতার কল্পনায় পর্য্যবসিত করা তাঁহার অভিপ্রেত বোধ
হয় নাই। কিন্তু সীতাহরণে রঘুকুলের যে অপমান হইয়া-
ছিল, সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-ব্যাপার কিছু তদপেক্ষা কম
অপমানের বিষয় নহে। গণেশসংহিতায় এই বস্ত্রহরণ-
ব্যাপারের সুন্দর তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। গণেশ বলেন,
যিনি ভগবদ্ভক্ত, শত্রুপক্ষের কেহই তাঁহার বাহ্য ও অন্তর্গ্লানি
সাধন করিতে সক্ষম নহে *। সীতার যেরূপ অপ-
কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অপকলঙ্ক নিবারণের জন্য ব্যাস
সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা কল্পনা করিয়াও সীতাহরণের বৃত্তান্ত
দিতে ছাড়িলেন না। তিনিও দ্রৌপদীর অন্তর্বল ও
ধর্ম্মতেজ দেখাইবার জন্য বনপর্ব্ব মধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-
হরণের আখ্যান প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতার

* ন বাহ্যোনান্তরঃ শত্রুর্ব্বাধতে ভগবজ্জনম্। ক্রোধ দুঃশাসনৌ কৃষ্ণা-
ব্যাপাদ পি ন ভেরতুঃ।

(গাণেশঃ ৫৯ শ্লোকঃ)

দ্ধার, মহাভারতীয় যুদ্ধ এবং দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধের সাদৃশ্য প্রতীয়মান করে। এই যুদ্ধ-ব্যাপারে আমরা বিদুরের সহিত বিভীষণের কি সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাই! পবননন্দন হনুমান পবনাংশ-সম্ভূত ভীমের সাদৃশ্য দেখাইতেছে।

রামায়ণে যেমন অযোধ্যার ঐশ্বর্য্য বনবাসের ভূমি প্রস্তত করিয়া দিয়াছে, মহাভারতেও তদ্রূপ ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য পাণ্ডবগণের বনবাসের কারণরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, এবং রামায়ণে যেমন বনবাসে মহাযুদ্ধের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে, মহাভারতেও তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্যহীনতায় এবং বনবাসেই কুরুক্ষেত্রের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি হইবার পর যুদ্ধের উভয়পক্ষীয় বীরগণ প্রাণসংহারক বৈরতায় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে লাগিলেন। যেন দেখা যাইতে লাগিল, ভবিষ্যগগণে এক মহা প্রলয়কারী জলদজাল উদিত হইতেছে—সেই জলদজালের পূর্ব্বান্ধকার পৃথিবীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে।

প্রয়োজন-সাদৃশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় যে কৃষ্ণতত্ত্ব পাওয়া যায়, মহাভারতেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মহাসত্ত্ব, সর্ব্বভূতের পরমাত্মারূপে সর্ব্বজীবে আছেন, যাঁহাকে লাভ করিলে সর্ব্বদুঃখের শান্তি হয়, সেই পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভের সাধনপথ-প্রদর্শক শাস্ত্রই মহাভারত। শুদ্ধ মহাভারত কেন, যে যে শাস্ত্র এই উদ্দেশ্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, তাহাদের একই নাম জয়। এই

জন্ত আমরা বলিয়াছি, রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্ত একই। শুদ্ধ রামায়ণ কেন, এই দেখুন জয় নামে কি কি শাস্ত্র বুঝায় :-

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কাৎ´স্নং বেদ পঞ্চমং যৎ তন্মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত এব শিবধর্ম্ম ও বিষ্ণুধর্ম্ম, ইহাদের নাম জয়। প্রাচীন ঋষিগণ এ সংসার-বিজয়ের পন্থার জন্য অত্যন্ত লোলুপ হইতেন। সেই প বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বেদব্যাস মূল মহাভারতসংহিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-লাভ সেই সংহিতার প্রধান উদ্দেশ্য। যে স্থলে মহাভারতের সকল গ্রন্থি একত্র করা হইয়াছে ও সকলসমস্যা পূরণ হইয়াছে, সেই ভগবদ্গীতায় এই উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র-রূপ মহা কর্ম্মক্ষেত্রের রণে যিনি কৃষ্ণে চিত্ত সমাধা করিয়া তাঁহাতেই সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করেন, তিনি পরি শেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারের দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত হয়েন,—এই কথার উপদেশ দিবার জন্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। এ মুক্তি-পথ রামায়ণে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহা ভারতেও তদ্রূপ। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, পাপ-পঙ্ক দশেন্দ্রিয়ের চিহ্ন স্বরূপ দশানন কল্পিত হইয়াছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকল যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে, তখন তাঁহার পরাক্রম দশাননের সমান। পাপ মানুষকে মৃত্যু ও ধ্বংস-পথে লইয়া যায়। এজন্ত আমরা দেখিতে পাই, দশানন মহাকালের সহায়তা লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিজয়ী রূপে সদর্পে সংসার-

গ্রামে বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াসক্তিতে লিপ্ত হইলে মানুষ পাপাচারে কেবল ধ্বংসের দিকেই আসিতে থাকে; সুতরাং পাপের প্রবণতা ধ্বংসের দিকে। যে শক্তি সেই ধ্বংস নিবারণ করিতে পারে তাহাই বিষ্ণুশক্তি। বিষ্ণুশক্তির অর্থ জীবের ও সংসারের রক্ষিণী শক্তি। বিষ্ণু স্থিতিকারী, মহেশ্বর রুদ্র প্রলয়কারী। মহেশ্বর তমোগুণে দশানন রূপে জীবে বিরাজিত, বিষ্ণু সত্ত্বগুণে রামরূপে তাহাতে আবির্ভূত *। পাপ জীবকে মৃত্যুতে আনে, ধর্ম্ম তাহাকে জীবন দান করে। কিন্তু পাপ যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, যখন দশেন্দ্রিয় প্রবল দর্পে বিষয়-ভোগে মুগ্ধ থাকে, তখন যজ্ঞীয় কর্ম্মক্ষেত্রোৎপন্না ধর্ম্মাসক্তি-রূপা বিষ্ণু-পত্নী সীতাকে সেই দশানন নিজ সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পায়। কিন্তু মানবের ধর্ম্মাসক্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি হাজার কেন পাপাকৃষ্ট হউক না, কিছুতেই পাপের সেবিকা হইতে চাহে না। যে জীবে সেবিকা হয়, সে জীব অনতিকাল-বিলম্বে মৃত্যু-মুখে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু যে জীবে না হয়, সে জীবে ধর্ম্মাসক্তি বিশুদ্ধভাবে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম্ম বিষ্ণুশক্তিরূপে এতই প্রবল হইতে থাকে যে, শেষে অন্তর্জগতে এক মহা যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে বিষ্ণুশক্তিরই জয়। রাম সীতাকে সমুদ্ধার করেন। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজিত ও বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সীতার একেবারে উদ্ধার সাধন হয় না। সীতার উদ্ধার-সাধন হইলে যখন তিনি কেবল রাম-সেবিকা রূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন জীব

* গীতা ষোড়শাধ্যায়ে উপদেশ দেন :—সংসারে মনুষ্যদিগের সৃষ্টি দ্বিবিধ, দৈবসৃষ্টি ও আসুর সৃষ্টি। দৈবীসম্পৎ মোক্ষের হেতু, আসুরী ও রাক্ষসী সম্পৎ বন্ধন-হেতু। আসুরী সম্পৎ তমোগুণ-প্রধান। দৈবী সম্পৎ সত্ত্বগুণপ্রধান।

ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইয়া বৈরাগ্য-হেতু একে একে সমুদা সংসার বিসর্জ্জন দিতে থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করি জীব তখন কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হইয়া জীব কেবল তত্ত্ব জ্ঞানে আসিতে থাকেন। সংসারের ধর্ম্মাসক্তি (সীতা) পর্য্যা ক্রমে বিসর্জ্জিতা হয়। ধর্ম্মের সহায় ও বীর্য্য-স্বরূপ লক্ষণও বর্জ্জিত হয়েন। জীব তখন একাকী মহাপ্রস্থানে আসিয়া ব্র পদ লাভ করিয়া মহা আনন্দ-সাগরে সমুদয় সংসার-দুঃখ চির দিনের জন্য নিমজ্জিত করেন। জীব পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয় ইহাই কৃষ্ণ-লাভ ও মোক্ষ। রামায়ণে যে মোক্ষ-পথ এই রূপ আখ্যায়িকা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভারতেও তাহাই প্রদ র্শিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির রূপ মহাদ্রুমের মূলে কৃষ্ণ বিরাজিত। দশাননের মত দুর্য্যোধনও শতভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মহা বলদর্পে কুরুক্ষেত্রের রণে আসিয়াছে। সেই রণে সর্ব্বপাপবীজ একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত না হইলে যুধিষ্ঠির তত্ত্বজ্ঞান-পথে সম্পূর্ণ রূপে অধি-ষ্টিত হইতে পারিবেন না। যখন সমুদয় কৌরবগণের ধ্বংস হইল, তখন যুধিষ্ঠির কি করিলেন? যুধিষ্ঠিরের তখন সমুদয় বিষয়াসক্তি তিরোহিত হইয়াছে,—তিনি হস্তিনার সিংহাসনে উঠিয়া আর রাজ-মুকুট ধারণ করিতে চাহেন না। যাঁহার বিষয়া-সক্তি তিরোহিত হইয়াছে, তিনি তখন তত্ত্বজ্ঞানে আরোহিত এবং সম্পূর্ণ সংসার-ত্যাগী। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, মহাযুদ্ধের অবসান হইলেই যুধিষ্ঠির সর্ব্বত্যাগী হইতেছেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী তাঁহাকে হাজার হাজার যুক্তি-কথায় প্রবৃত্তি দিতেছেন, সে সমুদয় কথায় তাঁহার একমাত্র উক্তি—"আমার

প্রবৃত্তি নাই।" নিবৃত্তিমূলক কথায় তিনি একেবারে সকলকে নিরস্ত করিতেছেন। তৎপরে ব্যাসের আদেশক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, যেমন সংসার-ত্যাগী অরণ্যাশ্রমী বানপ্রস্থ অরণ্য মাঝে ঋষিগণের পাদ-মূলে বসিয়া আরণ্যকের উপদেশ গ্রহণ করিতে বসেন, তিনিও তেমনি ভীষ্মের পাদ মূলে বসিয়া সমগ্র জ্ঞান-পথের তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই আমরা দেখিতে পাই, পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান। সেই মহাপ্রস্থানে অগ্রে দ্রৌপদী বিসর্জ্জিতা, তৎপরে একে একে সকল ভ্রাতৃগণ বিসর্জ্জিত হইলে যুধিষ্ঠির দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন। এই মোক্ষ-পথ সমস্ত জয় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-লাভের এই সাধন-পথ মহাভারতের প্রতিপাদ্য।

কল্পনা-সাদৃশ্য।

বাল্মীকি অন্তর্জ্জগতের বাহ্য-বিকাশ প্রকটনে প্রীতি পাইতেন, কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেরূপ ছিলেন না, তিনি অন্তর্জ্জগতকেই বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন। জীবের যখন বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে জীবকে তদ্রূপই দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি তাহা দেখান নাই। তিনি সেই বিষয়াসক্তি-বিবর্জ্জিত জীবকে রাজভোগে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, করিয়া তাঁহার বিষয়াসক্তি-তিরোধানের প্রভাব কেমন প্রভূত, তাহা প্রদর্শন করিলেন। বিশেষতঃ রামকে পূর্ব্বে কখন সিংহাসনে বসাইয়া বাল্মীকি দেখান নাই। বনগমন এবং বনবাস-কালে তিনি তাঁহাকে চিরদিন ত্যাগী রূপেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও রামচন্দ্র কেমন ত্যাগীর চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বাল্মীকি রামচন্দ্রকে

অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। রামচন্দ্র রাজছত্র ধারণ করিয়া এবং রাজৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া কেমন নিষ্কামভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপালন করিতেন, তাহারই চিত্র দিবার জন্য বাল্মীকি তাঁহাকে অযোধ্যারাজরূপে প্রদর্শন করিলেন। সিংহাসনারূঢ় হইয়া তিনি ত্যাগী ঋষি-চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়রাজ-অঙ্গে এক দিন ব্রাহ্মণ ত্যাগী ঋষিচরিত্র সম্ভবিতে পারে। তিনি দেখাইয়াছিলেন, রাজভোগ-মধ্যেও সমস্ত ঐশ্বর্য্যবিরাগী হইয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করা যায়। এই রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই বিষয়ভোগ, সমস্তই কর্ম্মযোগ, কর্ম্মযোগ মধ্যে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস। সকল কার্য্যই করিতে হইবে অথচ নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে সকল সমাধা করিতে হইবে। সংসারী অথচ সন্ন্যাসী। এই কঠিন ব্রত রামচন্দ্র একদা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, রামচন্দ্র একদিন দেখাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ঋষির নিস্পৃহ চরিত্র, ক্ষত্রিয়-ভোগী রাজ-অঙ্গেও সম্ভাবিত হয়। এই রাজর্ষি-চরিত্রের চরম আদর্শ দেখাইবার জন্য বাল্মীকি শেষে সীতার বনবাস কল্পনা করিয়াছেন। এইস্থলে বাল্মীকি রামচন্দ্রের কার্য্যদ্বারা দেখাইলেন, মোক্ষপথে আসিতে হইলে জীবকে কতদুর অনাসক্ত ত্যাগী হইতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিলেন। বাল্মীকি এইরূপে জীবের অন্তর্জ্জগতকে বাহ্য অবয়বে মূর্ত্তিমান করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস তাহা করেন নাই। বাল্মীকি যাহা মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্যাস সেই নীতির ব্যাখ্যা করিয়া ভগবদ্গীতা প্রস্তুত করিলেন। দার্শনিকের মত সেই নীতির ব্যাখ্যা দিয়া পরে যুধিষ্ঠির-চরিত্রে অন্তর্জ্জগতকে একেবারে দলে

লে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে গেলেন। কুরুক্ষেত্রীয় যুদ্ধের র আমরা সেই দৃশ্য দেখিতে পাই। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, হদেব ও দ্রৌপদী যতই ভোগ-প্রবৃত্তি-দায়ক কথা বলিতেছেন, ধিষ্ঠিরের হৃদয়-রাজ্য ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহার স্পৃহতা ও অনাসক্ততা ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সেই াবকে প্রগাঢ় ও প্রবল করিয়া দিবার জন্যই যেন দ্রৌপদী ও ীমার্জ্জুনাদি তদীয় ভোগবাসনা উদ্রিক্ত করিয়া দিতে প্রবৃত্ত ইয়াছেন। তাঁহাদের কথাসকল যতই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, াহাদিগের বাগ্মিতা যতই প্রবল ও বাক্‌কৌশলে পরিপূর্ণ হইয়া ঠে, যুধিষ্ঠিরের অনাসক্ততা ততই যেন দ্বিগুণ উদ্রিক্ত হইয়া ঠে। নিবৃত্তি-বল সমস্ত যুক্তি ও বাক্‌কৌশলকে পরাস্ত করিল। াল্মীকি এই অনাসক্তিকে রাজভোগে আনিয়া তাঁহার প্রাবল্যের াহ্য-বিকাশ দেখাইলেন। সেই অনাসক্তি হৃদয়-মধ্যে বলীয়ান ইয়া রাজভোগও কেমন তুচ্ছ করে, ব্যাস তাহাই দেখাইলেন। াস ও বাল্মীকি-প্রতিভার এই পার্থক্য জন্য তাঁহাদিগের কল্পনাও থক্ হইয়া পড়িয়াছে।

মহাকাব্যে ভগবদ্গীতা।

আর এক কল্পনায়ও তাঁহাদিগের প্রতিভার এইরূপ পার্থক্য ারদৃষ্ট হয়। বাল্মীকি একা রামচন্দ্রে মোক্ষার্থীর ধর্ম্ম-জগৎ াজাইয়াছেন, সেই ধর্ম্মবীরের বিপক্ষে রাক্ষসকুল। ব্যাসের োক্ষার্থী ধর্ম্মজগৎ, কৃষ্ণাশ্রিত যুধিষ্ঠির; তাঁহার বিষয়ী জগৎ, ধার্ত্ত- াষ্ট্রগণ। উভয় পক্ষই কুরুকুল-সম্ভূত। বাল্মীকির বিষয়ী পক্ষ

কিন্তু রাক্ষসকুল-সম্ভূত *। বাল্মীকি তাঁহার বিষয়ী পক্ষ
ইন্দ্রিয়-প্রবল দশানন রূপে সাজাইলেন। সেই ইন্দ্রিয়প্রব
রাবণের বাহ্য অবয়ব কিরূপ হয়, তিনি তাহা দশানন মূর্তি
প্রদর্শিত করিয়া বলিলেন, এই দশানন রাক্ষসকুল-সম্ভব। রা
সের ক্ষুধা যেমন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, ইন্দ্রিয়াসক্ত সংসা
জীবের ভোগলালসা তেমনি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সম
জগতের ধনভাণ্ডার ও সম্পত্তি ঐন্দ্রিয়িকগণের ভোগলালসা চ
তার্থ করিতে পারে না। এরূপ ঐন্দ্রিয়িক জীবকে রাক্ষস
বলিয়া কি বলিতে পারি? বাল্মীকি এজন্য দশাননকে রাক্ষসকু
সম্ভূত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ী লো
বাহ্যজগতে যেমন লোভমোহের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাক্ষ
রূপে প্রতীয়মান হয়, দশানন সেই রাক্ষসরূপে বাল্মীকির কল্পনা
দেখা দিয়াছিল। বাল্মীকি বিষয়-বাসনার অতৃপ্ত রাক্ষস-মূ
এত জাজ্বল্যরূপে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি দশাননে সেই মূ
প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্যাস কিন্তু তা
করেন নাই। ব্যাস ইন্দ্রিয়াসক্তের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুৎপিপাসা ধা
রাষ্ট্রগণের চরিত্র-বর্ণনায় প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসের কাব
কল্পনায় আমরা দেখিতে পাই, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি
সহিত সমবেত হইয়া যেন পৃথিবীকে আপনাদের লোভকবলে
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সেই সংসারিগণে

* প্রজাপতি সপ্তর্ষিগণ মধ্যে পুলস্ত্য একজন। পুলস্ত্য ঋষির দুই পু
অগস্ত্য বা জঠরাগ্নি এবং বিশ্রবাঃ। বিশ্রবা ঋষির পুত্র কুবের, রাব
কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। যক্ষ ও রাক্ষস দ্বারা আমাদের শরীর মধ্যে তামসি
ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কামাচার ও ব্যভিচারাদি রাবণ; নিদ্রাদি কুম্ভক
এবং শুভ বাসনার সহিত কামের মিলনই বিভীষণ।

ৎপত্তি কোথায়? যে হৃদয়ে মোক্ষ-ধর্ম্ম, সেই হৃদয়েই সংসারা-ক্তিরূপ মোক্ষবিরোধী অধর্ম্ম। ইহাদিগের জন্মস্থান একই। র্মাধর্ম্ম কার্য্যেই প্রতীত হয়। মানবের হৃদয়রাজ্যে যে কার্য্যা-ক্তি আছে, যাঁহার নাম কুরুরাজ, সেই কুরুরাজেরই বংশ পঞ্চ-াণ্ডব এবং দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা। ইঁহাদের যে বিবাদ, তাহা ীবাত্মার হৃদয়রাজ্যের ঘোর আভ্যন্তরিক গৃহবিচ্ছেদ ও হাযুদ্ধ। ব্যাস জীবের এই অভ্যন্তর দেশ যথাযথ চিত্রিত রিতে চান।

কুরুরাজের কর্ম্মভূমি কুরুজাঙ্গল বা কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে খিত আছে ঃ—

"মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল *।"

মানবের এই কর্ম্মভূমিতে ধর্ম্মাধর্ম্মের যে তুমুল সংগ্রামের কাশ হয়, সেই তুমুল সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র। ৌরবগণের এই গৃহসংগ্রাম প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইবার ন্য ব্যাসের মহাভারতীয় কাব্য-সৃষ্টি। ব্যাস মানবের ভ্যন্তর দেশকে দার্শনিকের মত কাব্য-কল্পনায় মূর্ত্তিমান করিয়া-ছেন। বাল্মীকি সেই অভ্যন্তর দেশের বাহ্য বিকাশকে প্রকটিত রিয়াছেন। এই জন্য একের কল্পনায় রাবণ রাক্ষসরূপে প্রতীত ইয়াছেন, অন্যের কল্পনায়, দুর্য্যোধনাদি পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবগণের হিত এক কুরুকুলেই সম্ভূত হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণের কাছে ই দুর্য্যোধনাদি যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বেই যে বিনষ্ট হইয়াছেন াহার আর সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি অর্জ্জুনকে সেই

* সম্ভব পর্ব্বাধ্যায়ের চতুর্নবতিতম অধ্যায় দেখ।

দুর্য্যোধনাদির বধার্থ উত্তেজিত করিয়া তাঁহার মোহ অপনয়
করিয়াছিলেন। কারণ, চিত্ত যখন সমুদয় প্রবৃত্তি-পথ বিসর্জ্জ
দেয়, তখনও যেন এক একবার তাহা সংসারের মোহে অভিভূ
হইতে থাকে। মন যেন সংসার ও বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া
ছাড়িতে চাহে না। সংসারের এমনি সুমোহন বেশ। এ
সুমোহন বেশে সংসার একদা ধর্ম্মবীর অর্জ্জুনকেও মুগ্ধ করিয়
ছিল। মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুন মোহনবেশধারী সাংসারিক মূর্ত্তিগণ
কিরূপে বিনষ্ট করিতে যাইবেন? সে বিষয়াসক্তি যে হৃ
হইতে যাইয়াও যাইতে চাহে না। হৃদয়ে এতদিন পোষি
করিয়া ধর্ম্মবীর কি বলিয়া সেই বিষয়াসক্তিকে অন্তর হই
তাড়াইয়া দিবেন? সে বিষয়াসক্তি যে আপনার সহিত মিশি
গিয়াছিল। সেই মোহ যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনা
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু জীব জানে না, সেই বিষয়
সক্তিই যাহা বাস্তবিক আপনার সেই আত্মাকে পর করিয়া দে
এবং যাহা বাস্তবিক পর তাহাকে আপনার করে। আত্মা গৃ
থাকিয়া বাহ্য পৃথিবীর বশ। আত্মা গৃহে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশ
কোথায় ইন্দ্রিয়গণ আত্মার বশবর্ত্তী হইবে, না, ইন্দ্রিয়গণের ব
বর্ত্তী আত্মা। জীব এই মোহে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনরূ
ভগবদ্গীতায় দেখা দিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সেই মো
অপনয়ন করিতেছেন। ব্যাস এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবে
অভ্যন্তর দেশকে মূর্ত্তিমান করিয়া মহাভারতের কল্পনাসৃষ্টি করিয়
ছেন। তিনি সেই অভ্যন্তরদেশকে দলে দলে বিকাশ করি
দেখাইয়াছেন। তিনি যে নীতি অনুসরণ করিয়া মহাভার
রচনা করিয়াছেন, সেই নীতির সারতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় ব্যাখ

রিয়া দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের
ন-তত্ব প্রকাশ করিয়া এককালীন ঐ মহাকাব্য দ্বয়ের সারতত্ব
দ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর দেখিলেন, সমগ্র ভারতীয় পর্ব্বের একে একে
ষ্য করা সামান্য কার্য্য নহে। এজন্য তিনি সমুদয় গ্রন্থের এক
ন্দ্র স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই কেন্দ্রদেশে তিনি এরূপ
জ্বল আলোকপাত করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সমুদয় মহাভারতীয়
স্তীর্ণ ভূমি আলোকিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় ঘটনা-
ঞ্জের সমুদয় রহস্য একত্র করিয়া অর্জ্জুন ভগবদ্গীতায় এক
হৎ সমস্যায় সমস্ত কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তিনি এই সমস্যায়
হাভারতীয় সমস্ত ঘটনার এক বৃহৎ গ্রন্থি দিয়া কৃষ্ণের নিকট
েই গ্রন্থি খুলিতে দিলেন। কৃষ্ণ তাহা অতি কৌশলে খুলিয়া
য়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সেই কৌশল দেখাইয়া দিয়া গ্রন্থিকে
িথিল করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই গীতার ভাষ্যে দেখাইয়া
য়াছেন যে, ভারতীয় সমুদয় ঘটনা বুঝিতে গেলে, পাঠক,
োমার জানা চাই যে, একমাত্র Principleএর জন্য, এক মাত্র
র্ত্তব্য-জ্ঞানে নিয়োজিত হইয়া ত্যাগ স্বীকার করাই মানবের
প্রধান কার্য্য ও গৌরব। এই ত্যাগস্বীকারে যে বিষয়বৈরাগ্য
ন্মে, তাহাই সংসার-রূপ কর্ম্মস্থলের প্রধান লক্ষ্য। সেই ত্যাগ-
ীকারে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনিই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মোক্ষ
ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। গীতার এই উপদেশ শুদ্ধ
হাভারতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা নহে, এই নিয়মে রামায়ণের
মগ্র ঘটনাবলীও নিয়োজিত হইয়াছে। রামায়ণে গীতার মত
কান পর্ব্বের বিন্যাস না থাকাতে তাহাতে সে নিয়মটি বুঝাইয়া

দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু মহাভারতে সে রহস্য বিশদরূ
খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আলোকে আমরা বিলক্ষ
দেখিতে পাই, রামায়ণোক্ত ও মহাভারতীয় সমগ্র ঘটনাবলী
নিয়মে চালিত হইতেছে। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে সং
হইয়া সমুদয় ত্যাগ-স্বীকার ও বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দিবার
শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণ-কল্পনারও সৃষ্টি। সেই ত্যা
স্বীকারের পার্থিব কর্ম্মফল যাহাই হউক না কেন, ঐ কর্ম্মফ
উদাসীন হইলে মানব পরমার্থ ধনে ধনী হইয়া চিরসুখী হই
পারে। এই সত্য মানব-মনে সংস্কারবৎ বদ্ধমূল করিয়া দিব
জন্য ভারতীয় কল্পনার সৃষ্টি ও কাব্য-রসের আয়োজন হইয়াছে
ব্যাস একজন মহা দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য তি
সমুদয় কাব্য-কল্পনায় যে সত্য লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দি
চাহেন, সেই সত্যের সমুদয় দার্শনিক তত্ত্ব এক স্ব
অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিলেন। রামায়ণ-পাঠে সেই সত্য-মাত্র হৃদ
চিরকাল বদ্ধমূল হইয়া যায়। রামায়ণে কাব্যরস ও সৃষ্টি এ
উচ্চতায় উঠিয়াছে যে, তাহাতে সেই সত্য যেন দ্বিগুণ ব
আসিয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়ে। মহাভারত এ
সত্যের চৈতন্য করিয়া দেয়, তুমি জানিতে পার, এই সত্যে
প্রকৃতি কিরূপ; কিন্তু রামায়ণ এই সত্যের চৈতন্য উৎপাদ
করিয়া দেয় না, তাহা অজ্ঞাতসারে তোমার হৃদয়-মধ্যে প্রবে
লাভ করে, অচেতন-ভাবে তোমার হৃদয়ে সংস্কারবৎ অবস্থা
করে এবং অজানত ভাবে তোমাকে জীবন-ক্ষেত্রে চালি
করিতে থাকে। মহাভারত পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহা
চৈতন্য হয়, রামায়ণ-পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহার চৈতন্য তত হ

বটে কিন্তু তাহার প্রভাব তোমার হৃদয়ে নিয়ত অনুভূত হইতে কে।

ভগবদ্গীতায় ব্যাস যাহা সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন, অনু-ায় তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভগ-ীতা কাব্যের যে স্থলে সন্নিবিষ্ট, সে স্থলে তত বিস্তৃত রূপে র্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার সময় নহে। এ জন্য অনুগীতার সৃষ্টি। যাহা হউক, পাণ্ডবগণের চরিত্র যে রূপ বিশুদ্ধ ভাবে চিত্রিত য়াছে, তাহাতে গীতোক্ত বাক্য সকল যে অর্জ্জুনের মুখে শেষ রূপে শোভা পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে কার ধর্ম্মপ্রশ্ন ও সমস্যা আর কোন জাতির ইতিহাসে গৃহ-চ্ছেদ-মূলক যুদ্ধ-ব্যাপারে উত্থাপিত হয় নাই। চরিত্র-সঙ্গতি ক্ষা করিবার জন্যও গীতার সমাবেশ আবশ্যক হইয়াছিল। মায়ণে রামপক্ষে অরাতি-বিনাশে আত্মকুলক্ষয়ের ভয় ছিল না লিয়া তাহাতে গীতার ন্যায় কোন অধ্যায়ের আবশ্যকতা য় নাই। গীতার সন্নিবেশ দ্বারা কাব্যরসের কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ইয়াছে বটে; কিন্তু মহাভারত মধ্যে গীতার প্রয়োজন ও উপ-াগিতা বুঝিয়া আমরা তাহার সমাবেশে তত দোষ দেখিতে াই না। গীতাতে ব্যাস সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া ন্দুর প্রকৃত মোক্ষপথ যেমন পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া য়াছেন, তেমন পরিষ্কৃত রূপে সংক্ষেপে কোথাও তাহা প্রদর্শিত া নাই।

এই গীতায় আমরা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের নীতি এবং র্শন তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই। সেই নীতি তত্ত্ব, কল্পনায় কেমন অবয়বী হইয়া বিশাল মহাভারত ও রামা-

য়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে প্র
পাইয়াছি। "রাঘব পাণ্ডবীয়ের" গ্রন্থকার এই কল্পনার এ
কত বিশদ রূপে ও কত সুন্দর কৌশলে কাব্যাকারে প্রক
করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা সেই গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই অ
গত আছেন। আমাদের শাস্ত্রালোচনায় বিলক্ষণ প্রতীতি
যে, প্রাচীনকালে মহাভারত ও রামায়ণের এইরূপ একত্ব পণ্ডি
মাত্রের মনেই জানা ছিল। কালবশে যত শাস্ত্রালোচনার হ্র
হইয়া আসিয়াছে, ততই সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কি
পুনরায় শাস্ত্রালোচনায় যে সেই জ্ঞান আবার পুনরুদিত হই
এমত প্রত্যাশা আমাদের বিলক্ষণ আছে। এক্ষণে সেই জ্ঞানে
পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতার
করিলাম। এতদ্দ্বারা আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমগ্র প্রম
দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোকপাত করি
সেইদিকে লোকের মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

মহাকাব্যের পার্থক্য।

কৃষ্ণচরিত্র।

আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে দার্শনিক তত্ত্ব-সমু-
দয়ের বিকাশ ও প্রসারণ বিশাল মহাভারত এবং রামায়ণ, ব্যাস
তাহা ভগবদ্গীতায় বিবৃত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতা মহাভারতের
মেরুদণ্ড ও অস্থিস্বরূপ। গীতার সম্প্রসারণই মহাভারত।
মহাভারত স্থূল দেহ, গীতার তত্ত্বসমুদায় তাহার আত্মা। গীতার
সহিত মহাভারতের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ট, এতই গভীর ও এতই
নিগূঢ়। গীতার স্থূল বিকাশ শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণও
তাহার স্থূল বিকাশ। তবে রামায়ণের সহিত মহাভারতের যে
বাহ্য পার্থক্য আপাততঃ প্রতীত হয়, তাহা ব্যাস ও বাল্মীকির
কল্পনার পার্থক্য জন্য। বিষয় এক হইলে কি হইবে, কল্পনা-
কারী গ্রন্থকার ত এক নহে। গ্রন্থকারের পার্থক্য জন্য বিষয়-
কল্পনার পার্থক্য। "মহাকাব্যের সাদৃশ্য" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা
দেখাইয়াছি, একই বিষয় ব্যাস এবং বাল্মীকির কল্পনায় কেমন
বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতিভার যে
প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে, "কাব্য—বনবাসে" নামক প্রবন্ধে
তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এই প্রস্তাবে ব্যাস ও
বাল্মীকির প্রতিভা-পার্থক্য আরও কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে
চাই।

ব্যাস "কৃষ্ণচরিত্রে" নারায়ণাংশ কাব্যমধ্যে পৃথক রাখিয়াছেন।

মহাভারতীয় মহাব্যাপার মধ্যে নারায়ণ কেমন নি
ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা কৃষ্ণচরিত্রে
দেখিতে পাই, ; সেই নারায়ণাংশ বাল্মীকি "রামচরিত্রে" প্রক্ষে
করিয়াছেন। রামচরিত্রে যে দ্বিভাব বর্ত্তমান, সেই দ্বিভা
বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র রূপে তাহা দেখাইবার জন্য ব্যাস দুই
স্বতন্ত্র চরিত্রের কল্পনা করিয়াছেন। সেই দুইটি চরিত্র—কৃষ্ণ ও
যুধিষ্ঠির। যিনি বাল্মীকির রামচরিত্র বুঝিতে চান, তিনি এক
কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই কৃষ্ণ ও যুধি
এক রামচরিত্রে সংশ্লিষ্ট। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির রূপে কার্য্য করি
যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার আত্মবিস্মৃতিতে নারায়ণের ভাব প্রচ্ছ
রহিয়াছে।

বাল্মীকি শুদ্ধ রামচরিত্রে এই নারায়ণাংশ প্রক্ষেপ করি
ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামায়ণের প্রথমাংশে আমরা রামচরিত্রে
যে নারায়ণের অংশ দেখিতে পাই, ক্রমে যখন সীতাহরণের
পর কার্য্য-পরম্পরায় কাব্যব্যাপার ঘোরতর হইরা উঠিতে লাগিল
যখন রামচন্দ্রকে বীরকার্য্যে শূর রূপে ব্যাপৃত হইতে হইল, যখন
তাঁহাকে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে মাতিয়া মহা বৈরনির্য্যাতন-
কার্য্যে অনুলিপ্ত থাকিয়া নররূপে অনুষ্ঠান করিতে হইল, যখন
তাঁহাকে বীরগণের মধ্যে কাব্যকল্পনায় হারাইতে থাকি, তখন
তাঁহার সেই নারায়ণাংশ কবি অন্য এক চরিত্রে ফুটাইতে লাগি-
লেন। তখন রামচন্দ্র বীর, মহাবীর, শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ বীর। তখন তিনি মহা বৈরব্যাপারে অনুলিপ্ত। তাঁহার
নারায়ণাংশ কার্য্যপরম্পরায় আচ্ছন্ন। তখন সেই নারায়ণাংশ
অন্য এক চরিত্রে দেখা দিল। সেই চরিত্র হনুমান। নারায়ণাংশ

এখন হনুমানে কার্য্য করিতে লাগিল। নারায়ণের সংসার-চক্রের চক্রিতা তখন হনুমানের বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাসিত হইল। এই হনুমানের আত্ম-বিস্মৃতিতে নারায়ণ প্রচ্ছন্ন রহিলেন।

এই হনুমান-চরিত্রে বাল্মীকি একত্র নারায়ণের কৌশল ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাস সেই চরিত্রেরই বিশ্লেষণ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রে নারায়ণাংশ দিয়া হনুমানের ভীম শক্তি ভীম-চরিত্রে কল্পনা করিলেন। মহাযুদ্ধে যেমন রামচন্দ্র, শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহায়তায় সর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি করিতেছেন, যুধিষ্ঠির তেমনি মহাধর্ম্মবীর্য্যস্বরূপ অর্জ্জুন এবং ধর্ম্মবল-স্বরূপ ভীমের সহায়তা লইয়া ভারতীয় মহাব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন। ধর্ম্মবীর্য্য এবং ধর্ম্মবল অপর সহায়তা ভিন্ন একা একাই সমুদায় পাপবল পরাস্ত করিতেছে। পবনদেব প্রচণ্ডবলে একাকী যেমন সম্মুখে সমস্ত বিধ্বংস করিয়া চলিয়া যান, ভীম ও হনুমান তেমনি একা একাই পাপের শত সহস্র মূর্ত্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন একাকী শতবার পাপ-বিপক্ষে জয়লাভ করিতেছেন। বাল্মীকি রাম ও লক্ষ্মণকে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন-বিপত্তির উপর জয়লাভ করিতে কল্পনা করিয়াছেন। এরূপ বীরত্ব কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মক্ষেত্রেই সম্ভব। মানুষ যুদ্ধব্যাপারে তত সম্ভব নহে। ধর্ম্মের সূর্য্যোদয়ে পাপের সমস্ত কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হয়। যিনি এই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ভীম ও অর্জ্জুন একা একা কিরূপে শত সহস্র বিপক্ষবলের উপর জয়লাভ করিতেছেন, হনুমান একাকী কিরূপে অদ্ভুতব্যাপার সমস্ত সম্পন্ন করিতেছেন এবং রামলক্ষ্মণ একা একাই কিরূপে অত্যাশ্চর্য্য অবদান-পরম্পরায় বিজয়ী হইয়া

উঠিতেছেন। এ সমস্ত সংগ্রাম সামান্য বাহ্য সংগ্রাম নহে, ‌ সংগ্রাম অধ্যাত্ম-রাজ্যের ঘোর যুদ্ধব্যাপার—যে যুদ্ধে সংসারে বিষয়াসক্তি, মায়ামোহ ও পাপ-তাপ এক দিকে, অন্যদিক ধর্ম্মের মহা বল-বিক্রম, শৌর্য্য ও বীর্য্য তুমুল কাণ্ড বাধাইয় মহোল্লাসে জয়শ্রীর উচ্চকেতনে নৃত্য করিতেছে।

রামায়ণে আমরা ধর্ম্মপক্ষে রামলক্ষ্মণ, ভরতশত্রুঘ্ন ও হনুমা রূপ পঞ্চশক্তির সংযোগ দেখিতে পাই, মহাভারতেও তদ্রূপ যুধি ষ্ঠিরের পঞ্চভ্রাতার সংযোগ। রামায়ণে ধর্ম্মের দৈবসহায় নারায় বিলুপ্ত ভাবে আছেন, ব্যাস সেই দৈব-সহায় নারায়ণকে পঞ্চ পাণ্ডবের কৃষ্ণরূপে পরিদৃশ্যমান করাইয়া সংসার-চক্র তদীয় হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবকল্পনা কো কাব্যে এত উচ্চতায় উঠে নাই। কোন কাব্যকার ঐশীশক্তিকে কাব্যচরিত্র-আকারে এত পরিপাটিরূপে রক্ষা করিতে পারে নাই। দান্তে, মিল্টন প্রভৃতি সকল ঐশীচরিত্রকল্পনাকার ব্যাসে নিকট পরাস্ত। বাল্মীকি যাহা রামচন্দ্রে ও হনুমানে প্রচ্ছন্নভাবে দেখাইয়াছেন, ব্যাস তাহা কৃষ্ণচরিত্রে উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমা করিয়াছেন। এত বড় প্রকাণ্ড মহা ঐশীচরিত্র কল্পনার যোগ্য বটে। এত নিগূঢ়, জটিল ও অসীম চক্রিতাপূর্ণ অনন্তের ছায়া রূপী কৃষ্ণ ভগবান-চরিত্রের উপযুক্ত বটে। সেই কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে সমুদায় মহাভারত ও সংসারকে যেন ছাইয়া ফেলিলেন তাঁহার বিশাল দেহ, সংসারে যেমন, তেমনি ভারতময় ওতপ্রোত হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অথচ তিনি নিজ হস্তে কিছুই করেন নাই। তিনি কর্তৃরূপে সমুদয় ব্যাপার চালাইতেছেন তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা,—ভারতে সর্ব্বেসর্ব্বা,—সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা

মহাভারত সমাপ্ত হইলে তুমি ভগবানের প্রকাণ্ড লীলা দেখিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলে। তোমার মন কৃষ্ণমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইল।

কল্পনা-পার্থক্য।

কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখিতে পাই, তাঁহারা যেন পঞ্চজনে একত্রীভূত একমাত্র বল। কোন কাব্যে পঞ্চভ্রাতা এমত ঘনিষ্টরূপে মিলিত হয় নাই। আবার কোন কাব্যে সেই পঞ্চজনের একৈকশক্তি স্বতন্ত্র রূপে তত বিরাটমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হয় নাই। যদি আর কোন কাব্যে পাঁচজনে একপ্রাণে মিলিত হইয়া থাকে, তাহা বাল্মীকির মহাকাব্যে। কেবল রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই—রামলক্ষণ, ভরতশত্রুঘ্ন ও হনুমান এক-প্রাণে ও ভক্তিতে সবাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। আবার স্বতন্ত্র-ভাবে উহাদের বিরাটমূর্ত্তি দেখ, এক এক জনের চরিত্রাঙ্কনে তোমার মন পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। পরিপূর্ণ কি, বুঝি মনে সে বিশালচিত্র ধরিয়া উঠে না। এই দুই মহাকাব্যের এই পঞ্চজনের চরিত্র এক অদ্ভুত চিত্র—এক অনুপম কল্পনা। সবাই বিচিত্র অথচ এক। সবাই স্বতন্ত্র শক্তি অথচ একত্রীভূত মহাশক্তি। ব্যাস ও বাল্মীকি এই স্থানেও অতুলনীয়।

কিন্তু এই স্থলেই ব্যাস ও বাল্মীকির বিভিন্নতা। ব্যাস, বাল্মীকির সৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাস ত বাল্মীকি নহেন। ব্যাসের কল্পনায় বাল্মীকি অদৃশ্য হইয়াছেন। বাল্মীকি কল্পনার স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া ভক্তির যে সৃষ্টিরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়া-ছেন, ব্যাস তাহা দেখিয়া মোহিত হইলেন। কিন্তু ব্যাস মোহিত

হইয়া ভাবিলেন, আমি এই সৃষ্টিরাজ্যের পর-পারে এক সদৃশ সৃষ্টিরাজ্য বিস্তীর্ণ করিব। ভক্তিপূর্ণ বারাণসীর পুণ্যধামের পরপারে আর এক সদৃশ পুণ্যধাম সৃষ্টি করিব। অধ্যাত্ম-দেশের পুণ্য সলিলা সাত্বিকীপ্রবৃত্তিরূপিণী ভাগীরথীর একপারে বাল্মীকির স্বর্ণচূড়া, অপর পারে ব্যাসের স্বর্ণচূড়া হাসিতে থাকিবে বাল্মীকি যে মোক্ষপথে কল্পনা বিস্তার করিয়াছেন, সেই মোক্ষ-পথ উত্তীর্ণ হইয়া আত্মা যে পথে বিচরণ করে, ব্যাস সেই দেশে স্বীয় কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাসের কল্পনা সেই দেশে অবাধে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বসংসার ছাইয়া ফেলিল। বাল্মীকির তীর্থধাম—ভক্তি, ব্যাসের মোক্ষধাম—জ্ঞান।

বাল্মীকি হৃদয়ে বলবান, ব্যাস জ্ঞানে মহীয়ান। বাল্মীকি যে হৃদয়ে ক্রৌঞ্চমিথুন-শোকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়ের আবেগে রামায়ণ-কল্পনায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস যে তপোবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বোধিত হইয়া ভারতীয় কল্পনাকে সজ্জিত করিলেন। বাল্মীকির ধর্ম্মক্ষেত্র হৃদয়, ব্যাসের কুরুক্ষেত্র জ্ঞান। এই জ্ঞানের কুরুক্ষেত্রে পাপকুল ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। বাল্মীকির কল্পনারাজ্যে হৃদয়ের প্রস্রবণ একেবারে শত ধারায় বিমুক্ত, ব্যাসের কল্পনারাজ্যে জ্ঞানের অসংখ্য দেশ বিরাজিত। বাল্মীকির পাত্রগণ হৃদয়ানুরাগে পরিপূর্ণ, ব্যাসের পাত্রগণ জ্ঞানবলে বলীয়ান্। রামচন্দ্রের ভ্রাতৃগণ হৃদয়ানুরাগে যাহা করে, তাহা যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ জ্ঞানবলে উত্তেজিত হইয়া সম্পন্ন করে। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান, সবাই রামানুরাগে পরিপূর্ণ, সবাই বীর বটে, কিন্তু ভক্তবীর। তাঁহাদের বীরত্ব ভক্তিতে উত্তেজিত। ভক্তিতে,

অনুরাগে ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুসরণ করিয়াছিলেন। মাতা বল, পিতা বল, কলত্র বল, বন্ধু বল কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই। বিষয় বল, সুখ বল, ঐশ্বর্য্য বল কিছুতেই তাহার রামানুরাগ ফিরাইতে পারে নাই। আর সীতা—আজিও সীতা রামানুরাগে ও পতিভক্তিতে নরজন-আরাধ্যা হইয়া আছেন। যে পতিভক্তিতে তিনি দেবোপমা, সেই পতিই বনগমনকালে তাঁহার অনুসরণ-ব্রত হইতে সীতাকে বিরত করিতে পারেন নাই। আবার ভরত—যে ভরতের জন্য তদীয় জননী রামকে বনবাসে পাঠাইলেন, সেই ভরতের ভ্রাতৃ-অনুরাগ কি প্রগাঢ়! সে ভ্রাতৃ-অনুরাগের কি আর তুলনা আছে? তিনি চিরদিন সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদপূজা করিয়া আত্মজীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। ওদিকে দেখ হনুমান—ওরূপ বীর—ওরূপ ভক্তবীর কি আর জগতে কখন দেখা দিয়াছিল। শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃ-অনুরাগে উত্তেজিত হইয়া কত দুঃসাধ্য ব্রতে, কত শঙ্কটে না পদার্পণ করিয়াছেন! এ সমুদায় ভক্তিরাজ্য—ভক্তিতে পাত্রগণ উচ্ছ্বলিত। এই ভক্তবীরগণের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞান অবনত। উঁহারা ভক্তিতে ও হৃদয়ানুরাগে উত্তেজিত হইয়া যাহা করিতেন, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাদিগের হৃদয় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া চলিত না, কিন্তু যাহা স্বতঃই আবেগ-বলে করিত, তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছিল। কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি তাঁহাদের হৃদয়াবেগের সঙ্গে নৈসর্গিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এমনি মিশিয়াছিল যে, তাঁহাদের হৃদয়াবেগ যেন অজ্ঞাতসারে কর্ত্তব্যের প্রণালীতে চলিয়া যাইতেছে। সেই হৃদয়াবেগ প্রশমন করিতে ধর্ম্মের প্রয়োজন হইত না, কিন্তু তাহা

স্বতঃই চালিত হইয়া যে পথে ধাবিত হইত, সেই পথই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইত। কারণ, স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র সে ভক্তি চালিত করিতেছিলেন। এই ভক্তিই সাত্ত্বিক ভক্তি—এই ভক্তি মোক্ষদাত্রী। এরূপ হৃদয় লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হয় না তাঁহারা ধর্ম্মপথ জগতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য উদি হন। এই গেল বাল্মীকির ভক্তিরাজ্য।

অন্যদিকে ব্যাসের ছবি দেখুন। ব্যাসের পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী কিরূপ কার্য্য করিতেছেন? রামচন্দ্রের বনবাস বাল্মীকি চিত্রিত করিয়াছেন, ব্যাস পাণ্ডবগণের বনবাসের ছবি দিয়া ছেন। কিন্তু যে বনবাসকালে বাল্মীকি জগৎকে কাঁদাইয় গিয়াছেন, সেই বনবাসকালে ব্যাস কি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার বনবাসযাত্রিরা যেন শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে নীয়মান হইয়া শুদ্ধ ধর্ম্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া বনে যাইতেছেন। একবার কুন্তীদেবী কাঁদিলেন, আর সব ফুরাইয়া গেল। দ্রৌপদী কি বনবাসে যোগ্যা, না বনবাসে যাইতে চাহেন? সীতা যেমন বনলতার মত রামের দেহাশ্রিতা হইয়াছিলেন, রাম যেখানে যাইতেছেন সেই বনলতা ও তৎসঙ্গে যাইতেছেন, দ্রৌপদী কি তদ্রূপ বনলতা, না তাঁহার কোন প্রভিন্নতা ছিল? আমাদের বোধ হয়, দ্রৌপদী লতা বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের যেন কতক স্বাধীন বৃত্তি আছে,সে লতা যেন নিজে নিজে কতক দাঁড়াইতে পারে। তথাপি দ্রৌপদী লতা-ধর্ম্মিণী বলিয়া বনস্পতির আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজের হ্রাস বৃদ্ধি বনস্পতির গাত্রে হেলাইয়া দিয়াছিলেন। বনস্পতির অবলম্বনে তাঁহার শিরোদেশে

ড়িয়া নৃত্য করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজ ইচ্ছা ও দয়াবেগ যে দিকে যাক, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞান তাহাদিগকে বনত করিয়া দিয়াছিল। যাহা দ্রৌপদীতে প্রত্যক্ষ, ভীমে াহা ততোধিক প্রত্যক্ষ। ভীমের হৃদয়বল বুঝি দুঃশাসনীয়। া বল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-প্রমাণ, ঝটিকার প্রচণ্ড প্রবাহ; ন্তু সেই বল, সেই তরঙ্গ ও সেই প্রবাহ যেন এক দৈব শক্তিতে শমিত হইয়া যাইতেছে। আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠি- তেছে—আবার তখনই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। কোন্ ক্তি এ হৃদয়াবেগ ফিরাইল? এ আশীবিষকে কে শান্ত রিল? সে শক্তি যুধিষ্ঠিরের বাক্য,—সে শক্তি ধর্ম্মের বাক্য —সে শক্তি কর্ত্তব্য-জ্ঞান। যে কর্ত্তব্যজ্ঞান ব্যাস গীতায় শিক্ষা দিয়াছেন, ব্যাস যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের ধর্ম্ম এরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে, সর্ব্ব সংসার এক দিকে আর কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্য দিকে—সেই অসীম প্রভাবসম্পন্ন, ধর্ম্মতেজে তেজীয়ান্ কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ব্যাস অযুত বলে বলীয়ান্ করিয়া ভীম-পরাক্রম ভীমের সমক্ষে যেই ধরিলেন, ভীম অমনি মস্তক অবনত করি- লেন। কুরু সভায় দ্রৌপদী নিগ্রহকালে এই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞান কি অমানুষ ব্যাপার না সম্পন্ন করিয়াছে! যাহা রক্তমাংস- সমন্বিত মানব-শরীরে কখনই সহ্য হয় না, সেই ভয়ানক দ্রৌপদী- নিগ্রহব্যাপার যখন সম্পন্ন হইতেছে, যখন পঞ্চমহাবল স্বামিসমক্ষে ীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা হইতেছে, তখন কোন্ শক্তি যুধিষ্ঠিরকে অচল ও অটল করিয়া দেবোপম করিয়াছিল, কোন্ শক্তি ভীমের তর্জ্জন গর্জ্জন থামাইয়া ছিল, কোন্ শক্তি অর্জ্জুনাদি অপর তিন্ ভ্রাতাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? যে স্থলে যুধিষ্ঠিরের একবার

একটা বাক্য মাত্রে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠে, মর্ত্ত্যধাম রসাতলে যায়, সে স্থলে যুধিষ্ঠির কি জন্য নীরব হইয়াছিলেন? এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার উত্থাপিত করিয়া ব্যাস দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে সর্ব্ব সংসার একদিকে, কর্ত্তব্যজ্ঞান আর এক দিকে হইলেও কর্ত্তব্য-জ্ঞান ধর্ম্মজীবিগণে কখন পরাজিত হইবে না। আবার একবার দেখ, কুরুক্ষেত্রের প্রতি চাহিয়া দেখ, যুদ্ধের প্রাক্কাল উপস্থিত, সমস্ত সংসার যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, এমত সময় অর্জ্জুনের মহা মোহ উপস্থিত। অর্জ্জুন কি বলিয়া আত্মকুলক্ষয়ে লিপ্ত হইবেন! তখন তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন দ্বিগুণ উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। এমত স্থলে ও এমত অবস্থায় বল দেখি, কার কবে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগরিত হইয়াছে? কিন্তু অর্জ্জুন সেই ভয়ানক অরাতি-নিপাতসময়ে কর্ত্তব্যজ্ঞানের ঘোর সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হইয়া একদা ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। যখন বুঝিলেন, নিঃসন্দেহ বুঝিলেন, যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তখন তিনি আবার সেই ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। এইরূপ সঙ্কট-স্থল বিরচন করিয়া ব্যাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার বীরগণ, তাঁহার পঞ্চপাণ্ডব সবাই জ্ঞানবীর ছিলেন। এই জ্ঞানের কাছে ভীমের প্রমত্ততা, প্রশান্ত অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও বীর্য্য পরাস্ত এবং দ্রৌপদীর বীরদর্প বিচূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা সবাই এই জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান যুধিষ্ঠিরকে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, স্থিরতার সাগর, গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতার প্রশান্ত প্রতিমা গড়িয়াছিল। কাব্যের অনেক স্থলেই যুধিষ্ঠিরকে দেবতা অপেক্ষাও মহীয়ান্ বলিয়া বোধ হয়। যে স্থলে দেব-কোপও প্রধূমিত হয়, সে স্থলেও যুধিষ্ঠির স্থির—অবাতবিক্ষোভিত

মহাসাগরের ন্যায় স্থির—পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটল ও অভেদ্য। কোন্ শক্তি প্রভাবে যুধিষ্ঠির দেবতা অপেক্ষাও গরীয়ান্? সেই শক্তি জ্ঞান। এত বড় জ্ঞান-বীর কোন কাব্যে কল্পিত হয় নাই। রামচন্দ্রও একদা সীতাদেবীকে হারাইয়া ত্রিভুবন কাঁদাইয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ অধীর ক্রন্দনে যুধিষ্ঠির কখন বিহ্বল হন নাই। পঞ্চ শিশু হত্যায় তিনি একবার কাঁদিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাঁদিয়া অধীর হয়েন নাই। আত্মকুলের সবাই বিধ্বংসপ্রাপ্ত, তথাপি যুধিষ্ঠির স্থির। যুধিষ্ঠির আত্মকুলক্ষয়ে সংসার-বিরাগী হইয়া প্রশান্তভাবে ভীষ্মের পাদমূলে বসিয়া তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিলেন। জ্ঞানবীরের চূড়ামণি যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে অন্য পাঁচজন জ্ঞানবীর—অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী। যুদ্ধাবসানে এই পঞ্চজন রাজ্যলোভী হইয়া যখন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনারূঢ় হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, বনবাসে গিয়া সময়ে সময়ে এই পঞ্চজনের অন্যতম যখন রাজ্য-ত্যাগের জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করিতেন, তখন কি অচল, অটল যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতীত হইত না? যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরতা ছিল বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। সর্ব্বাবস্থায় আপনার নির্ম্মল বুদ্ধি ও জ্ঞানে, ঠিক কর্ত্তব্য কি, যুধিষ্ঠির তাহা অবিচলিতচিত্তে অবধারণ করিতে পারিতেন। জ্ঞানের এইরূপ নির্ম্মলতা ও স্থৈর্য্যকে মুকুরবৎ প্রতীয়মান করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের কল্পনা। এইরূপ কল্পনায় ব্যাস অতুলনীয়। ব্যাসের এই জ্ঞানবীর-সকল অতি উজ্জ্বল বর্ণে প্রভাসিত। এই চিত্র সকল যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি বরাবর সঙ্গত বর্ণে উদ্ভাসিত। এই জ্ঞানবীরগণ ব্যাসের অতুলনীয় সৃষ্টি। বাল্মীকির

ভক্তবীরগণ যেমন তাঁহার অতুলনীয় সৃষ্টি, ব্যাসের জ্ঞানবীরগণ তদ্রূপ সৃষ্টি। বাল্মীকি দেখাইয়াছেন, অটল ভক্তি যেরূপ মোক্ষের সোপান, ব্যাস দেখাইয়াছেন, অটল ধর্ম্মজ্ঞান তদ্রূপ মোক্ষের কারণ। যে জীব এই জ্ঞানবলে বলীয়ান, মুমুক্ষু হইয়া তিনি সকল সংসারকেও একদা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই মোক্ষ যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার নিকট আত্মকুলের মমতা অকিঞ্চিৎকর। গীতায় এই মহা সত্য ও জ্ঞান উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মোক্ষার্থী করিয়াছিলেন। এই অর্থেই গীতার বাক্য সকল অখণ্ডনীয়। আত্মকুলের মমতা কখন লোকের অকিঞ্চিৎকর হয়? যখন তাঁহার স্থির লক্ষ্য মোক্ষের প্রতি। অর্জ্জুনের লক্ষ্য সেই মোক্ষের প্রতি স্থির করাইবার জন্য, কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মকুল ও গুরুজনের মমতা বিনষ্ট করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই জ্ঞানের রাজ্য মহাভারতে। ভক্তির রাজ্য যেমন রামায়ণে, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের রাজ্য তেমনি মহাভারতে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান কি রামায়ণে বিদ্যমান নাই? রামায়ণেও তাহা বরাবর দেদীপ্যমান। বাল্মীকি কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ভক্তির অনুসারী করিয়া দিয়াছেন, ব্যাস ভক্তিকে জ্ঞানের অনুসারী করিয়াছেন। বাল্মীকি দেখাইয়াছেন যে, রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাপালনকে প্রগাঢ় পিতৃভক্তির অনুসারী করিয়াছেন। ব্যাস যুধিষ্ঠিরের ভক্তি, ও অপর

---

* হিন্দুধর্ম্মে মুক্তিপথ অতি সুদীর্ঘ। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এক একবিধ মুক্তি সাধন হয়। এইরূপ চতুর্ব্বিধ স্তর বা মুক্তি হিন্দুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে। লয়মুক্তিই শেষ মোক্ষ। এই মোক্ষ না হইলে জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় না। মায়া মমতা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উঠা যায়। তাহা হইলেই সালোক্য মুক্তি লাভ করা যায়। "কাব্য—রামপ্রসাদে" নামক প্রস্তাবে এ সকল কথা যে স্থলে বিস্তারিত রূপে বলা হইয়াছে, সেই স্থল দ্রষ্টব্য।

চারিভ্রাতার ভ্রাতৃভক্তি এবং দ্রৌপদীর পতিভক্তিকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন। পঞ্চভ্রাতার মাতৃভক্তি দ্রৌপদীর বিবাহান্তে একদা মাতৃ-আদেশের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। জ্ঞানদ্বারা হৃদয়ের এইরূপ শাসন মোক্ষপ্রদ। হৃদয়ের শাসন জগতে বড় বিরল। ধন্য সেই জীব, যিনি হৃদয়কে যুধিষ্ঠির ও ভীমের ন্যায় শাসন করিতে পারিয়াছেন। তিনি যথার্থ মোক্ষধামের অধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র। *

রসের পার্থক্য।

ব্যাস ও বাল্মীকির প্রতিভার এইরূপ প্রভেদ বুঝিতে পারিলে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের কল্পনার প্রভেদ বুঝিতে পারিব। কাব্যাংশে বাল্মীকির প্রতিভা করুণাদি কোমল রসে বিশেষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি সেই রসে আমাদের হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন। ব্যাসের প্রতিভা বীরাদি উগ্র রসে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাল্মীকি যেমন এক এক বিষয়ে বিজয়ী, ব্যাসও তেমনি অপরাপর বিষয়ে বিজয়ী। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে ব্যাস একেবারে অতুলনীয় ও বিশ্ববিজয়ী। রামায়ণে

* রামায়ণ ও মহাভারতের ভক্তবীর এবং জ্ঞানবীরগণ আদর্শ চরিত।— কাব্যের কল্পনা-ভেদে আদর্শচরিত কেমন বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা এই প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইল। মুক্তিরূপ লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আদর্শের বিভিন্নতা ঘটিবার কোন বাধা নাই। কবি-ভেদে আদর্শ-চরিত বহুবিধ হইতে পারে। স্বাধীন কল্পনার বাধা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্য স্থির থাকিলে গন্তব্য পথ অনেক হইতে পারে। এজন্য হিন্দু পৌরাণিক কাব্যে অনেক আদর্শ-চরিত পাওয়া যায়। যিনি যে পথ দিয়াই যাউন না কেন, গন্তব্য স্থল একই। হিন্দুর আদর্শ আবার আধ্যাত্মিক অবস্থাভেদে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। একই আধ্যাত্মিক অবস্থায় আসিবার পন্থা যেমন বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, তেমনি উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠিবার পথও নানাবিধ হইতে পারে।

বাল্মীকির পাণ্ডিত্যের কিছু অভাব নাই বটে, রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির পাণ্ডিত্য সমভাবে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই কাব্যে রসপ্রাচুর্য্য এত অধিক যে, সেই রসের খেলায় মন আর্দ্র হয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের তত অনুভব করিতে পারে না। কাব্য রসের মোহ কথঞ্চিৎ অপনীত না হইলে আমরা রামায়ণের জ্ঞানদেশে প্রবেশ করিতে পারি না। ব্যাস রস-তরঙ্গিত মহাবেগের মধ্যে আনিয়াও আমাদিগকে জ্ঞানদেশ দেখাইয়াছেন। চারিদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সভাপর্ব্বে রাজসভা মধ্যে দ্রৌপদী-নিগ্রহকালে নানারসের সমুদ্র-প্রমাণ মহা তরঙ্গ উঠিতেছে, তন্মধ্যে দ্রৌপদী-বাক্যের মহা সমস্যা উত্থাপিত এবং ভীমার্জ্জুনাদির মহা কর্ত্তব্যজ্ঞানের শিক্ষা। বাল্মীকির উপদেশ রসতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া যায়, মন না ভাবিয়াও ধর্ম্মার্থ লাভ করে; ব্যাসের উপদেশ রসের প্রতীপগামী, জ্ঞান আসিয়া ব্যাসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রশমিত করে। রসের সহিত জ্ঞানের অভিঘাতে ব্যাস শিক্ষা দেন। কিন্তু তাহাতে স্থায়ীরসের কোন ব্যাঘাত হয় না। রামায়ণে তুমি রসের অনুগামী হইয়া বরাবর জ্ঞানসাগরে আসিয়া পড়িবে. ব্যাস তোমাকে রসস্রোতে লইয়া গিয়া এক একবার বলিবেন, এইখানে স্থির হও, দেখ রসতরঙ্গের দুই পার্শ্বে এবং বক্রগতি তটিনীর সম্মুখদেশে, যথায় তাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাস লাঞ্ছিত হইয়া বিভিন্নদিকে তরতর বেগে যাইতেছে, একবার আসিয়া এই সকল জ্ঞানদেশের শোভা দেখ, মোহিত চিত্তে একবার জ্ঞানরাজ্যের দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, তবে স্বর্গদেশে উত্থিত হও। রামায়ণে আমাদের বোধ হয়, আমরা তরঙ্গিণীর সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া গিয়া মহা

সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছি ; মহাভারত মধ্যে বোধ হয়, আমরা গঙ্গাপ্রবাহের বিপরীতে উত্থিত হইয়া গোমুখীতীরে যাইয়া বুঝি মোক্ষধাম লাভ করিব। ভাগীরথী-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতনমুখে যাও, সেখানে সাগর-সঙ্গমে মহাসমুদ্রের গ্রাসে তোমার লয় সাধন হইবে ; আবার তাহার উৎপত্তিমুখে আইস, সেখানেও হিমাচলের হিমসাগরে গোমুখীতীরে তোমাকে বিলীন হইতে হইবে। রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান সরযূতীরে, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান হিমাচলের হিমসাগরে। উভয়েই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

রামায়ণের করুণরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস একটানা স্রোতে মহাকাব্যকে প্লাবিত করিয়া যাইতেছে। বাল্মীকি এই রসে রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি হৃদয়-ব্যথায় পৃথিবীকে নিমজ্জিত করিবার জন্য করুণ-রসের প্রস্রবণকে একেবারে শতধারায় বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সে রসের মহা তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অন্য রস তত মিশিতে চায় না। রাম-বনবাস-কালে কৈকেয়ীর ব্যবহারে হৃদয়াঙ্গ একদা একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই করুণরসের মহা প্রবাহ আসিয়া সেই হৃদয়কে একেবারে আর্দ্র করিয়া ফেলে। স্থায়ীরস, সঞ্চারী ভাবকে সরাইয়া দেয়। তুমি রামের জন্য, সীতার জন্য, লক্ষ্মণের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়া শেষ করিতে পার না। বনে যাও, সেখানে সীতাহরণে রামচন্দ্রের ক্রন্দনে বনবাসী পশু, পক্ষী ও তরু-লতার সঙ্গে তোমাকে চক্ষুজলে বনদেশ ভাসাইতে হইবে। বাল্মীকি কাব্যের সর্ব্বস্থলেই করুণ রসের উপকরণ যোজনা করিয়াছেন। কতবার কত স্থলে লোককে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদাইতেছেন। সীতাহরণের পর রাম যেমন

রোদন-ধ্বনিতে পশু, পক্ষী ও বৃক্ষগণকেও কাঁদাইয়াছিলে বনগমনোদ্যোগী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তদ্রূপ সমস্ত লোকমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। সেই করুণ রসের স্রোত আবার অশোক কাননে। সীতার দুঃখে তথায় কে না কাঁদিতেছে? দুর যুদ্ধোদ্যোগ ভুলিয়া পাঠক বুঝি সীতার দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেন হনুমানের সঙ্গে সীতার বিলাপ-বাক্যে শোকাবেগে ব্যথিত হন যুদ্ধ মাঝে ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের সঙ্গে এবং রামের মায়া-মণ্ড-দর্শনে সীতার সঙ্গে পাঠক কাঁদিতে থাকেন। তৎপরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাসে কে না নয়ননীরে পৃথিবী আ করিয়াছেন? রামায়ণে এই স্থায়ী রসস্রোত সমভাবে প্রবল প্রবাহে বহিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু মহাভারত কিরূপ রসের আধার? রামায়ণ যেমন করুণ রসে উছলিয়া পড়িতেছে, মহাভারত তেমনি বীররসে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। মহাভারতে নানা সঞ্চারী রসের অভিঘাতে হৃদয় স্তম্ভিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহার স্থায়ী রস ঠিক আছে। ব্যাসের রমণস্থল কুরুক্ষেত্রের সাংগ্রামিক ব্যাপার। সেই ব্যাপারের মধ্যে আমরা কাব্য-রসে কভু বিমুগ্ধ, কভু স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। একদা বীরে উৎসাহিত, আবার করুণে বিগলিত হইতে থাকি। লোমাঞ্চের সহিত অশ্রুবর্ষণ করি। সপ্তরথীর মাঝে অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া শরীর লোমাঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু তাহার দশা ভাবিয়া আবার তখনই কাঁদিতে থাকি। দিবাযোগে যুদ্ধ-ব্যাপারে প্রমত্ত হই, রাত্রিযোগে পঞ্চশিশু-হত্যায় কাঁদিয়া উঠি ব্যাসের হৃদয় করুণ, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর রসে পরিপূর্ণ বাল্মীকির হৃদয় ও মুখমণ্ডল সকলই করুণরসে কমনীয় কান্তি ধারণ

করিয়াছে। রামের বনবাস-কালে একবার রামায়ণ দেখ, তখন রাজসভায় যাও, পথে ঘাটে যাও, গ্রামে গ্রামে বেড়াও, যেখানে যাও, সেইখানেই দেখিতে পাইবে, সমস্ত লোক রোরুদ্যমান হইয়া এক মহা শোকাবেগে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাল্মীকি এথায় কত উপকরণ দিয়া নিজ কাব্যকে করুণরসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন দেখ, তাহা কি নির্ব্বাসন বলিয়া প্রতীতি হইবে? সে স্থলে দেখিতে পাইবে, বীরগণ বীরের ন্যায় নির্ব্বাসনে উদ্যোগী হইয়াছেন! পঞ্চপাণ্ডবগণ সহসা একদিন আস্তে আস্তে বনবাসে গমন করিলেন। সঙ্গে কেবল হাজার হাজার অনুযাত্রী যাইতেছে—যেন রাজসভা উঠিয়া বনে যাইতেছে। ব্যাস কি বাল্মীকির মত করুণ রসের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন? রাম এবং লক্ষ্মণও বীরের ন্যায় বনে যাইতেছেন বটে, কিন্তু পাঠকের মন তখন কি রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি চাহিয়া থাকে? রাম ও লক্ষ্মণের পরিপার্শ্বে তখন এত ক্রন্দন-রোল, যে সে রোলে হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। লক্ষ্মণের বনগমনের সঙ্গে ভীমার্জ্জুনের বনগমন তুলনা হয় না। লক্ষ্মণের বনগমন কেবল হৃদয়ের ব্যাপার। প্রত্যুতঃ রামের বনগমন কালে পাঠকের হৃদয় যে মহা মনোবেদনায় উদ্বোধিত হয়, তাহা পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন-কালে অনুভূত হয় না। ব্যাস এই নির্ব্বাসনস্থলে নিজ কাব্যকে তত করুণরসের উপকরণে সজ্জিত করিতে পারেন নাই। পঞ্চপাণ্ডবেরা বীরের ন্যায় বনবাসে গেলেন। সে স্থলে করুণের সহিত গম্ভীর রসের সঞ্চার।

ব্যাস অন্য সময়ে অন্য রূপ মনোবেদনার উৎপাদন করিয়াছেন। যে সময়ে দ্যূত-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির ও ক্রমে অপর পাণ্ডবগণ

সমস্তঐশ্বর্য্যহীন হইতেছেন, এবং এই ঐশ্বর্য্যহীনতার ফল যে সময় ফলিয়া আসিতেছে, সেই সময়ে ব্যাস যে মনোবেদনা উৎপাদন করিয়াছেন, সেই মনোবেদনা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। তখন মন পঞ্চপাণ্ডবগণের সহানুভূতিতে একেবারে গলিয়া যায়। কিন্তু সে মনোবেদনার সঙ্গে অনেক অপর ভাব আসিয়া সঞ্চারিত হয়। মন একদা রাগে ও দুঃখে পরিপূর্ণ হয়। সেই দারুণ উৎপীড়নকালে যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরতায়, এবং ভীমের আক্রোশে মন একদা দোদুল্যমান হইতে থাকে। মনে নানা গভীর রসের সঞ্চার হয়। ব্যাস এই প্রকার গভীর রসের উৎপাদনে বড়ই নিপুণ ছিলেন, এবং সেইরূপ রসের উপযোগী করিয়া আপন কাব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। বাল্মীকি যে রসে একেবারে অতুলনীয়, তিনি সেই রসের উপযোগী করিয়া আপন কাব্যোপকরণের সংস্থান করিয়াছেন। এই কারণে মহাভারতের কল্পনা ও ঘটনাপুঞ্জ, রামায়ণের কল্পনা ও ঘটনাপুঞ্জের সহিত বিভিন্নাকারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে, বাল্মীকি ও ব্যাসের বিভিন্নতা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়।

কাব্যকিঙ্করী।

মন্থরা।

রামায়ণের ঐশ্বর্য্য, অযোধ্যা ও লঙ্কা; মহাভারতের ঐশ্বর্য্য, হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ। বাল্মীকি ভালবাসিতেন, প্রভাত ও সান্ধ্য তপনের মনোহর মূর্ত্তি; ব্যাস ভালবাসিতেন, দিনদেবের বিরাট বিকাশ। বাল্মীকি একদা ভারতের মধ্যদেশে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, ঐশ্বর্য্যদেব তপনবৎ অযোধ্যার উদয়াচলে প্রভাসিত হইয়া স্বকিরণে জগৎ আলোকিত করিতেছেন; সেই অযোধ্যার প্রভাবরশ্মি হিমাচলের পার্ব্বত্যদেশ হইতে দক্ষিণে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে। আবার আর এক সময়ে ঋষি ফিরিয়া দেখিলেন—সন্ধ্যাগগনে হেমময় রূপবিভায় সেই দিনদেব লঙ্কার কনককিরীটে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া যেন অস্তাচলের অবলম্বী হইয়াছেন—লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-প্রভা সমুদ্র হইতে সেই গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে। বাল্মীকি এইরূপ ঐশ্বর্য্যবিভায় অযোধ্যা ও লঙ্কাকে সাজাইয়াছেন; কিন্তু ব্যাস হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্যকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণবৎ প্রভাসিত করিয়া এত সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, যেন বোধ হয়, সেই ঐশ্বর্য্য দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় অতি বিরাট ও রুদ্রমূর্ত্তিতে ভারতের মস্তকোপরি অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারত একদা আলোকিত করিতেছে। বাল্মীকি ও ব্যাসের ঐশ্বর্য্য-কল্পনার এইরূপ প্রভেদ। অযোধ্যার প্রভাব যত দূর বিস্তীর্ণ ছিল, রামচন্দ্র

তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন; হইয়া দেখিলে অযোধ্যার প্রভাব যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে আর এ রাজ্যের প্রভূত বল-প্রভাব আসিয়া উপনীত হইতেছে। তি মনুষ্যধাম পার হইয়াছেন; আসিয়া পড়িয়াছেন, বানর ও রাক্ষ রাজ্যে। মানবধামের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, তথ যমপুরীর দ্বারদেশ অবস্থিত। প্রাণে না মারিয়া কৌশলপূ যিনি তাঁহাকে এরূপ মৃত্যুমুখে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার ন মন্থরা। রামচন্দ্র—শূরবীর, মন্থরা—ছলনায় বীরাঙ্গনা। এক শূরবীর ছলনায় পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে প্রেরিত হইয়াছিলে যুদ্ধবীর চাতুরীতে পরাস্ত। মন্থরা সেই চাতুরীর কুজামূর্ত্তি।

সূর্পণখা।

বাল্মীকির কল্পনায় অযোধ্যা ও লঙ্কা, এই দুই প্রধা প্রভাবশালী রাজ্য সজ্জিত হইয়াছে। এই দুই রাজ্য এক সংঘর্ষে আসিয়া অন্যতর বলের বিনাশ-সাধন করিয়াছি এই সংঘর্ষণে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাই রামায়ণের র ব্যাপার। এই বৃহৎ ব্যাপার রঘুবীর কর্তৃক সমুৎপাদিত হ এই বৃহৎ ব্যাপার সংঘটনার্থ রামচন্দ্র গোদাবরী-তীরে এক চতু অবলা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; অন্য এক বীরাঙ্গনা-রাক্ষসী মোহিনী মায়া তাহাকে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিয়া দে মন্থরার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়া যখন তিনি অযোধ্যার শে সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আর এক মোহিনী জালে পতিত হইলেন। এই মোহিনীর মোহ জালে পড়ি তাঁহাকে গোদাবরী-তীর হইতে লঙ্কার রাক্ষস-রাজ্যে আসিতে

হইয়াছিল। ঘটনার এক তরঙ্গে গোদাবরীর তীর, আর এক তরঙ্গে লঙ্কার দক্ষিণ সীমা। রামায়ণে এই দুই ঘটনায় দুইটি তুমুল কাণ্ড সম্পন্ন হয়। এই দুইটী তুমুল কাণ্ডেরই মূলে দুইটি রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মন্থরা, অন্য জন সূর্পণখা। সংসারের সমস্ত ব্যাপারই প্রবৃত্তি-মূলক। একদা প্রবৃত্তি মন্থরা-রূপে, অন্য সময়ে প্রবৃত্তি সূর্পণখার প্রলোভনীয় মোহিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। প্রলয়-কাণ্ডের মূলে প্রবৃত্তির কৌশলময়ী কুব্জামূর্ত্তি, অথবা রাক্ষসীর মায়াময়ী মোহিনীমূর্ত্তি। এ প্রবন্ধে আমরা প্রলয়কারিণী মন্থরাকে দেখিব।

লেডি ম্যাকবেথ।

যে প্রলয় মন্থরা ঘটাইয়াছিল, তাহা বড় সামান্য নহে। সে প্রলয়ে রাজার রাজ্য গিয়াছে, অযোধ্যার অধীশ্বরের নিপাত হইয়াছে। অথচ যুদ্ধ ঘটে নাই, রক্তপাত হয় নাই। সকলই কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিনে রাম চৌদ্দবৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যের ভয়সঙ্কুল মহাবনে প্রেরিত হইলেন, সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। আর এক দিনে রাজা দশরথ আস্তে আস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এক কারণে দুই জনেই গেল, কৌশল সিদ্ধ হইল। লেডি ম্যাকবেথ এরূপ করে নাই। মন্থরা ও লেডি ম্যাকবেথ দুই জনেই লোভে প্রতাড়িত হইয়াছিল। ম্যাকবেথ সম্মুখে রাজসিংহাসন দেখিয়া-ছিল। মন্থরা ঠিক রাজসিংহাসন দেখে নাই বটে, কিন্তু সেই সিংহাসন-লভ্য রাজসুখ তাহার সম্মুখে ছিল। সেই সিংহাসন ও সুখভোগ কিরূপে লব্ধ হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে যে পথ

যে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে পৃথক্ করিয়া দে
ম্যাকবেথ একরাত্রে যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, মন্থরাও একরা
তদনুরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। উভয়ই যে অ
সময় পাইয়াছিল, সে সময় মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি করিতে গেলে রক্ত-
পাতই সহজ উপায় বলিয়া প্রতীত হয়। লেডি ম্যাকবেথ সে
উপায়ই অবলম্বন করিয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিল, কিন্তু চতুর
মন্থরার উপায় অন্যবিধ; মন্থরার মন্ত্র,—চাতুরী ও কৌশল
মন্থরা হিন্দুদাসী, ম্যাকবেথ ইংরাজ উচ্চ-কুলোদ্ভবা রমণী
ইংরাজ রাজকুলবধূর নৃশংস ব্যবহারে হিন্দুদাসীও ভীতা হ
হিন্দুরাজ-দাসী ততদুর কঠিন-হৃদয় হইতে পারে না। দাসী
বিনা রক্তপাতে ও কেবল চাতুরিবলে একরাত্রে পৃথিবী উল্টাইয়া
দিল। যে সুখের সূর্য্য অযোধ্যায় উঠিয়াছিল, সে সুখের সূ
সেই রাত্রে যে অস্ত গেল, আর দেখা দিল না। দিবা প্রভা
হইল, কিন্তু সে দিবা কালরাত্রি অপেক্ষাও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন
এই জগৎ সুখে ভাসিতেছিল, অমনি তাহা ঘোর দুঃখসাগরে
নিমগ্ন হইল। এত অল্পকালে সহজে এমত প্রলয়কাণ্ড কেহ কখন
ঘটাইয়া তুলে নাই। একরাত্রে যেমন হাস্যময় শস্যক্ষেত্রে পঙ্গ-
পাল আসিয়া সকল বিনষ্ট করিয়া যায়, একরাত্রে তেমনি মন্থ
অযোধ্যার সুখময় সমুদয় দেশকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিল।

কৈকেয়ী।

লেডি ম্যাকবেথ লোভের লোহিত রক্তময়ী মূর্ত্তি। মন্থরা
লোভের কুচক্রী মন্ত্রণাময়ী মূর্ত্তি। ম্যাকবেথ শুদ্ধ লোভ, মন্থরা
শুদ্ধ লোভ নহে। মন্থরার লোভ যত না ছিল, দ্বেষ,মদ, মাৎসর্য

তদপেক্ষা অধিকতর ছিল। মন্থরা মহিষীর সুখভাগিনী। শুদ্ধ সুখভাগিনী নহে, অধীশ্বরের অধীশ্বরীর সুখভাগিনী। যে সুখে কৈকেয়ী সুখিনী, মন্থরা সেই সুখের ভাগিনী। শত শত রাজ্যের অধীশ্বর দশরথ, দশরথের অধীশ্বরী কৈকেয়ী; সপ্ত শত মহিষীর স্বামী দশরথ, দশরথের স্বামিনী কৈকেয়ী। কৈকেয়ী যে উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তথা হইতে দেখিতেন, তাহার নিম্নে একোন সপ্তশত মহিষী, নিজে রাজা দশরথ, এবং দশরথের অগণ্য রাজ্য-দেশ। এই গরবে কৈকেয়ী রাজ-রাজেশ্বরী। কৈকেয়ী,কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে পরাভূত করিয়া দশ-রথের একাধীশ্বরী হইয়াছেন। একাধীশ্বরী গরবে ও রাজ-আদরে আদরিণী। কৈকেয়ীর দৃষ্টিতে একাধীশ্বরীর আদরের গর্ব্ব, পরশ্রী-কাতরতার বিদ্বেষ, এবং প্রভুত্বের উজ্জ্বলতা জাজ্বল্যমান ছিল। চলিবার সময় কৈকয়ী আদরে খসিয়া পড়িতেন, বিদ্বেষভাবে এক একবার দূরে দৃষ্টিপাত করিতেন এবং মদগর্ব্বে ফুলিয়া বেড়াইতেন। এতদূর উচ্চতায় মন্থরা তাহাকে আনিয়াছিল; আনিয়াছিল মন্থরা তাহারই সুখের ভাগিনী হইবার জন্য। যে চক্ষে কৈকেয়ী শত শত মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, মন্থরাও সেই চক্ষে দেখিত। মন্থরার রাজ্য আরও অধিক; মন্থরা শুদ্ধ মহিষীগণের প্রতি সেই চক্ষে চাহিত না, সেই মহিষীগণের শত সহস্র দাসীগণের প্রতিও সেই চক্ষে চাহিত। এত মহিষী ও এত দাসী না থাকিলে কৈকেয়ীর গর্ব্ব এত উঠিত না। কৈকেয়ী যদি দশ-রথের একমাত্র মহিষী হইতেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীর গর্ব্ব সামান্যই হইত। কিন্তু কৈকেয়ী শত শত মহিষীর মধ্যে দশ-রথের একমাত্র মহিষী। এই জন্যই তাঁহার এত গর্ব্ব, এত

অহঙ্কার। শত শত মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ী দর্প দেখাইয়া বেড়াইতেন; শত শত মহিষীর শ্রী বিধ্বস্ত করিয়া কৈকেয়ী শত গুণ শ্রী-ধারণ করিয়া তেজস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার তেজ এত লোককে দেখাইবার ছিল। ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবার তিনি এত পরিসর পাইয়াছিলেন। মন্থরা আবার তদপেক্ষাও তেজস্বিনী হইয়াছিল। তাহার প্রখরতা কৈকেয়ীর অপেক্ষাও অধিকতর ছিল। মন্থরা দেখিত, তাহারই শক্তিতে শত শত মহিষীর দশা কিরূপ ঘটিয়াছে; কৈকেয়ীও সেই দশা দেখিয়া সুখলাভ করিতেন। মন্থরা আবার সেই মহিষীগণের দাসীদিগেরও দুর্দ্দশা দেখিত। কাহারও একটু শির তুলিবার বা উচ্চ দৃষ্টিতে চাহিবার যো ছিল না। চাহিলেই দেখিতে পাইত, উপরে কৈকেয়ীর তেজ এবং তদপেক্ষাও তাহার দাসীর তেজ। সূর্য্য অপেক্ষা বালি অধিকতর উত্তপ্ত। সূর্য্যের উত্তাপ মস্তকেও সহ্য হয়, কিন্তু বালির উত্তাপ পদতলেও সহ্য হয় না।

কৈকেয়ী শত শত মহিষীকে পরাভূত করিয়া একাকিনী রাজ-আদরিণী হইয়াছিলেন। এই জয়লাভ তিনি একদিনে করিতে পারেন নাই। সুধু সৌন্দর্য্য-গুণে এতদূর ঘটে না। গুণ না থাকিলে কোন ললনার রূপমোহ বেশী দিন থাকে না। রমণীরা পুরুষের যে চিত্ত হরণ করে, সৌন্দর্য্য তাহার প্রথম উপায় বটে, কিন্তু সে উপায় শেষ উপায় নহে। রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। প্রথমে রূপ, তার পর গুণ চাই। যে রমণী শুদ্ধ রূপ লইয়া স্বামীর নিকট আইসে, তাহার আদর অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রূপের সঙ্গে গুণ চাই। শেষে গুণই প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শুদ্ধ গুণে অনেক রমণী জগৎ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। গুণই রমণীগণের

মহার। যে সংসারে কৈকেয়ী থাকিতেন, সে সংসারে ভূপতির চিত্তহরণ করিবার শত শত মহিষী বিদ্যমান। রূপে সবাই রাজান্তঃপুর আলোকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রূপবল কাহার ক'দিন ছিল? গুণই উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। লাভ করিয়া কৈকেয়ীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা করিয়াছিল। কৈকেয়ীর গুণের এত কি গরিমা যে, শত শত মহিষী পরাভূত হইল? কৈকেয়ীর অঙ্গে যে সমস্ত গুণ ছিল, সে গুণগ্রামের মোহিনী শক্তি মন্থরার মন্ত্রণায় উত্তর উত্তর বাড়িয়াছিল। মন্থরাই কৈকেয়ীকে সর্ব্বজয়শীলা করিয়া তুলিয়াছিল।

অনেক সপত্নীর মধ্যে যে রমণী একাকিনী স্বামীর আদরিণী হয়েন, তাহার গর্ব্ব, প্রফুল্লতা, উল্লাস, উৎসাহ ও তেজ যত বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তাহার স্বভাব ততই নৃশংস হইয়া আইসে। অপরের পীড়া উৎপাদন না করিলে, নিজের জয়লাভ হয় না। এই পরপীড়া একদিনের জন্য নহে, চিরজীবনের জন্য। সপত্নীগণের প্রাণে চিরব্যথা দিয়া কৈকেয়ী একাকিনী পতি-আদরিণী হইয়াছিলেন। চিরদিন, প্রতিক্ষণে, তাহাকে সেই ব্যথা দেখিতে হইত। পরের গাত্রদাহ কৈকেয়ীর সুখের কারণ হইয়াছিল। পরে ছট্ ফট্ করিতেছে, কৈকেয়ী হাসিতেছেন। শুদ্ধ কৈকেয়ী নহে, মন্থরাও গালকাত করিয়া হাসিতেছে। দু'জন নয়, দশজন নয়, একোন সপ্তশত মহিষীর কাতরতা ও অন্তর্ব্বেদনা কৈকেয়ী স্বচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে দেখিতেন। একদিন নয়, দু'দিন নয়; এক বেলা নয়, দু'বেলা নয়; চিরদিন ও সর্ব্বক্ষণ কৈকেয়ী পরযন্ত্রণায় অকাতরা ও সুখিনী। এইরূপে কৈকেয়ী বিজয়িনী। মন্থরা সেই বিজয়ে উল্লাসিনী। কৈকেয়ীর

স্বভাব কতদূর নৃশংস হইয়া আসিয়াছিল, মন্থরা তাহা বিলক্ষ জানিত। যে দ্বেষে কৈকেয়ী পরতাপে অকাতরা, সেই দ্বে মন্থরাও অকাতরা।

কৌশল্যা।

রাজসংসারের অন্তঃপুরে মন্থরা এতদূর কাণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সমস্ত ব্যাপার আমরা কৌশল্যার শোক-বাক্যে বুঝিতে পারি। রামের বনবাস-সংবাদ শুনিয়া স্বীয় পুত্রের নিকট কৌশল্যা দেবী এইরূপে রোদন করিতেছেনঃ—

"রাম, আমি স্বামীর রাজত্বে কল্যাণ বা সুখ লাভ করি নাই; পুত্রের পৌরুষে সুখ লাভ করিব, এই মনে করিয়া এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও প্রধানা হইয়া আমাকে অপ্রধানা হৃদয়-বিদারিণী সপত্নীদিগের অমনোজ্ঞ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে হইবে। হাঃ আমার যে রূপ অসীম দুঃখ, মহিলাদিগের তাহা হইতে অধিকতর আর কি দুঃখ হইতে পারে? তুমি সন্নিহিত থাকিতেই আমি রাজা দশরথ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইলাম! তুমি বিদেশস্থ হইলে, আমার আর কি ঘটিবে? নিশ্চয় মৃত্যু হইবে বোধ হয়! আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান কি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন! হাঃ! যে সকল ব্যক্তি আমার সেবা বা অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারাও কৈকেয়ীর পুত্রকে অবলোকন করিয়া আমার সহিত সম্ভাষা করে না। হা পুত্র! তোমার বিরহে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া, আমি কি প্রকারে সেই নিয়তকোপনা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর বদন দর্শন করিব! হে রঘুনন্দন! তোমর অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বর্ষকাল অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি এতাদৃশী জীর্ণা হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম দুঃখজনক সপত্নীদিগের কুব্যবহার সহ্যকরণে অধ্যবসায়ও করিতে পারি না!"

রাজা দশরথ।

কৌশল্যার কাতর বাক্যে আমরা এই রাজ-অন্তঃপুরের নিদয় রহস্যের পরিচয় পাই। মন্থরা কৈকেয়ীকে যেরূপ গড়িয়াছিল, সেই কৈকেয়ী দশরথকে তদনুরূপই বশীভূত করিয়া আনিয়াছিলেন। দশরথকে এতদূর বশীভূত হইতে হইয়াছিল যে, তাঁহাকে পরমারাধ্যা কৈকেয়ী দেবীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইত। কোথায় বৈজয়ন্ত-ধামে দেবাসুরের যুদ্ধ ঘটিল, রাজা দশরথ যখন তৎসাহায্যে গেলেন, কৈকেয়ী অমনি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রণয়াবদ্ধ দশরথের নড়িবার চড়িবার শক্তি ছিল না; তিনি চিনিতেন কৈকেয়ী-ভবন, কৈকেয়ী চিনিতেন দশরথকে। দশরথ কৈকেয়ীর জন্য অন্য কোন মহিষীর অন্তর্ব্বেদনায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহাকে অনেকাংশে পরপীড়ায় অকাতর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু দশরথ কৈকেয়ী দেবীর কণামাত্র মনোবেদনা সহ্য করিতে পারিতেন না। যিনি এতদূর আদরের আদরিণী, তাঁহার সর্ব্বদাই অভিমান জন্মিবারই কথা। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। কথায় কথায় আদরিণী অভিমানিনী হইতেন, অভি-মানিনী হইয়া ভূমিতলে পড়িতেন। ভূমিতলে পড়িতেন বলিয়া তাঁহার জন্য শ্বেতমর্ম্মরতল-নির্ম্মিত ক্রোধাগার প্রস্তুত হইয়াছিল। মিথ্যা হউক, সত্য হউক, একটু ছল পাইলেই কৈকেয়ীদেবী পতিসোহাগে মানিনী হইতেন। যদি ভুলক্রমে একদা নৃপতি কৌশল্যা দেবীর ভবনে পদার্পণ করিতেন, আর সেই সংবাদ মন্থরা আনিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে পৌঁছাইয়া দিত, তবে আর কৈকেয়ীর ক্রোধ দেখে কে? ক্রোধে আট খানা হইয়া মানিনী

অমনি ক্রোধাগারে চলিয়া যাইতেন। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া প্রাণসমা প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া একেবারে পৃথিবী শূন্য দেখিতেন। হা কৈকেয়ী, যো কৈকেয়ী বলিয়া ক্রোধাগারে যাইতেন। যাইয়া যাহা ভাবিতেন ও বলিতেন, এই দেখুন বাল্মীকি তাহার কিরূপ অনুলিপি দিয়াছেন ঃ—

"পরে তিনি দুঃখে অতীব উত্তপ্ত হইয়া সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উত্তম শয্যা-শয়ন-যোগ্যা কৈকেয়ীকে ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন। সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা ভূমিশয়না পাপমনোরথা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতা, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ্যক্ষয়ে স্বীয় লোক হইতে পতিতা কিন্নরী, স্বর্গপরিভ্রষ্টা অপ্সরা, আবদ্ধা হরিণী এবং স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্টা মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দেখিলেন। পরে সেই বিমোহিত রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া যে রূপ অরণ্যে হস্তী ব্যাধকর্ত্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্বারা সমাহতা করেণুকে স্নেহ সহকারে হস্তদ্বারা মার্জ্জন করে, সেই রূপ স্নেহসহকারে কমলনয়নী কৈকেয়ীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিলেন এবং কহিলেন, হে দেবি ! যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে, আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে যে কেহ তোমাকে পরাভব করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিন্দা করিয়াছে ; তজ্জন্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিবার অভিলাষে ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে কল্যাণি ! আমি তোমার প্রিয়সাধনে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমার চিত্ত প্রমথন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ ? * * *

কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছে, আমার কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধীন জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহাতে আবার আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। অতএব, হে শোভনে কৈকেয়ি ! তোমার এত আয়াস করিবার আবশ্যক নাই। সূর্য্য যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদূর পর্য্যন্ত আমার অধিকার আছে—সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু,

সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদায় রাষ্ট্রই আমার অধীন, এবং ঐ সমস্ত জনপদে অজাবিক, ধন, ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে কৈকেয়ি! যদি তোমার কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই ভয়ের কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। যেরূপ সূর্যাদেব অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই রূপ আমি সেই ভয়ের কারণের উচ্ছেদ করিব।"

কৈকেয়ী নৃপতিকে এতদূর অধীন করিয়া আনিয়াছিলেন। মন্থরা জানিত, কৈকেয়ীর জন্য মহীপতি অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন, অথবা যে কোন প্রকারে হউক, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কারণেই তাঁহাকে ক্রোধিতা দেখিতে পারেন না।

রাজ-অন্তঃপুর।

কৈকেয়ীর অন্তঃপুর-রাজত্ব কিরূপ ছিল, এখন বোধ হয় তাহার অনুরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রাজত্ব মন্থরা গড়িয়াছিল। এই রাজত্বে কৈকেয়ী সুখিনী, মন্থরা তাহার সুখভাগিনী। এই রাজত্বের সমুদায় সৎপরামর্শ মন্থরা দিত। মন্থরা তজ্জন্য দাসী হইয়াও কৈকেয়ীর সখী হইয়াছিল। তাহাদের উভয়েরই স্বার্থ এক, একত্র বাস, একত্র নির্জনে কথাবার্ত্তা। মন্থরার কথা কৈকেয়ী বুঝিতেন, কৈকেয়ীর কথা কেবল মন্থরা বুঝিত। দু'জনে সমবেদনায় গ্রথিতা ছিল। যেমন মায়ের কথা শুদ্ধ ছেলে বুঝিতে পারে, ছেলের কথা শুদ্ধ মায়ে বুঝিতে পারে; যেমন স্ত্রীর কথা স্বামী বুঝে, স্বামীর কথা স্ত্রী বুঝে, আর

কেহ বুঝিতে পারে না, অন্য লোকের কাছে তাহাদের ভাষা সমুদায় দোধাই, তদ্রূপ কৈকেয়ী ও মন্থরার ভাষা তাহারা পরস্পরেই বুঝিত, অন্য লোকের কাছে সে ভাষা ও কথাবার্ত্তা সমুদায় দোযাই। কৈকেয়ীর যে কোন ত্রুটি ঘটিত, মন্থরার পরামর্শে তাহার সমুদায় পরিশোধন হইত। কৈকেয়ীর হাতে যে রাজ্য ছিল, মন্থরার হাতে তাহার শাসনরজ্জু। এ রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত ভাবনা চিন্তা, তাহা কৈকেয়ীর নহে, তাহা মন্থরার বিষয়। এ সুখসম্পদ বজায় রাখিবার জন্য মন্থরা সর্ব্বদাই ভাবিত। মন্থরা ভাবিত, যত দিন রাজা দশরথ, তত দিন এই সুখ-সমৃদ্ধি। বৃদ্ধরাজ অযোধ্যার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেই এ সুখ আর থাকিবে না। এ ভাবনার বিশেষ কারণও ছিল।

মন্থরার সঙ্কল্প।

মন্থরা জানিত, জ্যেষ্ঠাধিকার-রাজনীতি-অনুসারে কৌশল্যা-নন্দন রঘুবীর রামচন্দ্রই দশরথের পর অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকারী। বৃদ্ধরাজ শীঘ্রই রাজ-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, তখন রামচন্দ্রই অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলেই, কৈকেয়ীর সিংহাসন অধস্তলে গেল। কৈকেয়ী একবারে পাতালে, কৌশল্যাদেবী স্বর্গে, মর্ত্ত্যে সুমিত্রাদেবী ও অপরাপর রাজ-মহিলাগণ। তখন কোশল-রাজনন্দিনীর প্রাদুর্ভাব। কৌশল্যা তখন সমস্ত নিগ্রহের প্রতিশোধ তুলিবেন ; অশ্বপতি-নন্দিনীর প্রতিফল হইবে। তার সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা আপনার সমুদয় দুর্দ্দশা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইত।

নিজ তেজস্বিনী বুদ্ধি-হেতু এ দুর্দ্দশা নিবারণের উপায় দেখিতে মন্থরার অনেক দিন বিলম্ব হইল না। মন্থরা ভাবিল, রামের বদলে ভরতের রাজ্য-লাভ হইলেই এই অমঙ্গল নিবারিত হইবে। মন্থরা যখন এইরূপ ভাবনায় ব্যাকুলা, এমত সময় কৈকেয়ী দেবী বৈজয়ন্ত-ধাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দৈত্যসংগ্রামে-বিক্ষত রাজা দশরথের সেবা করিয়া কৈকেয়ীর যে ফললাভ হইয়াছিল, তাহা মন্থরা শুনিল। অমনি উদ্ভাবিনী বুদ্ধি প্রভাবে মন্থরা উপায় স্থির করিল। তাহার চক্ষে আশার আলোক প্রভাসিত হইল। মন্থরা শত গ্রন্থিতে সেই কথা মনে মনে গাঁথিয়া রাখিল।

মন্থরা ভাবিল, রাজা দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কৈকেয়ী-দেবী সেই দুইটী বর তখন গ্রহণ না করিয়া যে বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন, কুব্জা মনে মনে সে বুদ্ধিকে শত সহস্রবার প্রশংসা করিল। ভাবিল, কুব্জা-শিষ্যের এই উপযুক্ত বটে। তখন কুব্জা চাতুরিজালের তন্তু পাতিল। বিনাইয়া বিনাইয়া চাতুরিজাল প্রস্তুত করিল। দশরথ রাজা অতি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। একদিকে সত্য, অন্য দিকে সমস্ত রাজ্য ও সংসার। চতুরা সেই ধর্ম্মকে আপনার অধর্ম্ম সাধনের বিশিষ্ট উপায় করিয়া লইল। যৌব-রাজ্যে রামাভিষেকের পূর্ব্বেই কৈকেয়ীকে দিয়া দশরথকে এমত শপথ করাইতে হইবে, যেন তিনি সেই দুই বর তাঁহাকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হন। এক বরে রামের দণ্ডকারণ্যে বনবাস, অপর বরে ভরতের সিংহাসন-লাভ। রাম-প্রকৃতির পরিচয় মন্থরা যতদূর পাইয়াছিল, তাহাতে রাম যে স্বীয় জনককে সত্য

হইতে বিচলিত হইতে দিবেন, তিনি এমত পাত্র নহেন। দণ্ডকারণ্যের মহাবনে গেলে, রামকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ভরত চিরদিনের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ভরতের সিংহাসন বজায় থাকিলেই, কৈকেয়ী দেবীর রাজ্য বজায় রহিল। তাহা হইলেই মন্থরাকে আর কে পায়?

কৈকেয়ী ও মন্থরা।

মন্থরা এই কল্পনা আঁটিয়া বসিয়া রহিল। যখন রামাভিষেকের কথা উথাপিত হইবে, তখন তার কথা। কৈকেয়ী দেবীকে কোন কথা কহিল না, পাছে চঞ্চলা কৈকেয়ীর পেটে সে কথা হজম না হয়; হজম না হইলেই সর্ব্বনাশ! রাজা ঘুণাক্ষরে সে কথার বাষ্প পাইলেই মন্থরার কল্পনা বিফল হইবে। কুব্জা এমন কাঁচা মেয়ে নয় যে, সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করে। কুব্জা কেবল কাল-প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সে কাল শীঘ্র উপস্থিত হইল। রামাভিষেকের সম্বাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল; কেবল জানিতে পারিল না, কৈকেয়ী ঠাকুরাণী আর চতুরা মন্থরা। অনেক কৌশলে বৃদ্ধ রাজা তাহাদের নিকট একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু চারচোকো চুলবুলে মন্থরা তাহা বাহির করিয়া ফেলিল। ঠাকুরাণী নির্ভাবনায় সুখ-পর্য্যঙ্কে শয়ানে আছেন, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু দাসীর ঘুম নাই। দাসী সন্ধানে সন্ধানে টের পাইল, চারিদিকে কি একটা মহাব্যাপার হইতেছে। তাহার খবর কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট জানা চাই। কারণ, অল্পবুদ্ধি মেয়ে মানুষের পেটে কোন কথা থাকে না; কুব্জা তাই বুঝিয়া ধাত্রীর সন্ধানে ছাদের উপর

ঁটিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতেই, সে অমনি কথা বাহির রিয়া দিল। কুব্জা আরও জানিল, আর কাল বিলম্ব নাই, র-দিবসেই রামের অভিষেক হইবে।

এক দিনে কুব্জাকে সব গড়িতে হইবে। ঠাকুরাণী নিদ্রা াইতেছেন; মন্থরা ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া সত্বরা তাঁহার ঘরে অগ্নিশর্ম্মা-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। এইবারে কৈকেয়ীর সঙ্গে তাহার বুঝা-পড়া। এই ঘোর বিপদ-কালে কৈকেয়ী কেন নিদ্রিতা? কুব্জা কোপনশব্দে সেই বিভীষিকার ঘোর রোল তুলিল। সেই রোলে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইল। অন্তঃপুরের দূর দেশে যেন প্রতিধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল। কৈকেয়ী দেবী চমকিলেন। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বিভীষিকার কারণ কি? দশরথ রাজার বহুবিধ নিন্দা করিয়া কুব্জা কুসম্বাদ বিদিত করিল।

এই স্থলে আমরা মন্থরার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। দাসী যে সমস্ত কথায় ঠাকুরাণীকে নিজ অভিসন্ধিতে লওয়াইয়া আনিতেছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মানব-প্রকৃতির অন্ধিসন্ধি মন্থরা কেমন বুঝিত, তাহা এই কথোপকথনে প্রকাশিত আছে। এক বাগ বিফল হইল, মন্থরা অমনি আর এক বাগে ঠাকুরাণীকে ধরিল। শেষে যথন মন্থরা তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল, তখন ঠাকুরাণীকে এমন করিয়া সে বাগাইয়া লইল যে, কৈকেয়ী আর কিছুতেই ফিরিতে পারিলেন না। তখন জগৎ-সংসার এক দিকে, কৈকেয়ী অন্যদিকে। ঠাকুরাণীকে লওয়াইবার সময়ে কুব্জা যে রূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ গুণপনা কোন দাসীতে লক্ষিত হয় না। আমরা একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

প্রথমে মন্থরা বলিল :—

"হে দেবি, তোমার অক্ষয় সৌভাগ্য-বিনাশকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। এজন্য আমি দুঃখ-শোকাকুলা হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্না হইয়াছি, কেন না তোমার দুঃখে আমার দুঃখ হয়।"

রাম যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে কৈকেয়ীর কিরূপ দুর্দশা ঘটিবে, প্রথমে চতুরা সেই কথা বলিয়া ঠাকুরাণী রাজা দশরথ কর্ত্তৃকই যে সেই রূপ দুর্দ্দশাপন্না হইবেন, তাহারই উল্লেখ করিল। উল্লেখ করিয়া রাজার প্রণয় যে কেবল শঠতা ও প্রতারণা মাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিল। রাজার ব্যবহারের যতদূর পারে নিন্দা করিয়া শেষে কহিল :—

"এক্ষণে তোমার নিজ কল্যাণ-সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে,—তুমি আপনাকে, ভরতকে ও আমাকে রক্ষা কর।

মন্থরা অবশ্য আপনার সুখ চাহিত ; শুদ্ধ সুখ নয়, নিজ তেজ ও দর্প সকলই বজায় রাখিতে চাহিত। কিন্তু সে সমুদায় কৈকেয়ীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। সুতরাং কৈকেয়ীর যাহাতে সুখ-সম্ভোগ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহাকে উত্তেজিতা করিল। যে সুখরাজ্য কৈকেয়ী ও মন্থরা স্থাপন করিয়াছিল,আজি তাহা অবসান-প্রায় দেখিয়া দাসী কৈকেয়ীকে প্রথমে উদ্বোধিত করিয়াছিল।

কৈকেয়ীর বিশ্বাস ছিল, রাম-রাজত্বকালে তাঁহাকে যে নিতান্ত অসুখিনী হইতে হইবে, এমত নহে ; রাম তাঁহাকে মাতৃ-নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। এজন্য রামের প্রতিও তাঁহার মাতৃস্নেহ ছিল। সেই স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি রাম-

ষেকের সংবাদে পরম আহ্লাদিতা হইলেন। সেই আহ্লাদে সীকে উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন।

দাসী কিন্তু সে আভরণ-দানে ভুলিবার পাত্রী নহে। রাণীর র্ষের কারণ দাসী বুঝিতে পারিল। রাম-রাজত্ব ও ভরতরাজত্বে ণীর সুখ-সৌভাগ্যের যে প্রভেদ আছে এবং তাহাদের অন্তঃপুর-জত্বের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে, কুব্জা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। স্তু কৈকেয়ীর তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই। তজ্জন্য দাসী কুরাণীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইতে গেল। বুঝাইতে গেল, ম রাজা হইলে, কৌশল্যা দেবীরই মহা প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। খন কৈকেয়ীর প্রভুত্ব গিয়া কৌশল্যার প্রভুত্বকালের উদয় ইবে। কৌশল্যা দেবী তখন সমুদায় নিগ্রহের প্রতিশোধ লিবেন। রাম তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিলে কি হয়, কৌশল্যা দেবী কিরূপ ব্যবহার করিবেন? কৌশল্যা দেবীর ব্যবহার দূরে থাক, নিজ ভরতের অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ ম্ভাবনা।

দশরথের নিন্দা করিয়া মন্থরা মনে করিয়াছিল, তাহাতে কেয়ীর রোষাবেশ হইবে; কিন্তু দাসী দেখিল, ঠাকুরাণী াহা গায়ে মখিলেন না। কারণ, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ইলে যাহা অবশ্য ঘটিবার তাহা ঘটিবে, এজন্য মহিষী রাজার কান দোষ দেখিলেন না। মহিষী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ামের পর ভরতের রাজত্ব আসিবে। দশরথের কথাবার্তায় তনি হয় ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। রাণী আরও জানিতেন য, রামরাজত্বে কোন অসুখের কারণ হইবে না। এই বিশ্বাসে কৈকেয়ী মন্থরার কথায় তত তাতিয়া উঠেন নাই। তাতিয়া

উঠা দূরে থাক, আরও বরং মন্থরাকে পরমাহ্লাদে আভরণ প্রদ
করিয়াছিলেন। মন্থরা তখন আর এক উপায় দেখিল। পুত্রে
অনিষ্টের কথা বলিলে কোন্ জননীর প্রাণে আঘাত
লাগে? কৈকেয়ী শুদ্ধ রাণী নহে, শুদ্ধ সপত্নী নহে, গর্ভধারিণী
বটে। জননীর স্নেহ বড় সামান্য পদার্থ নহে। এখন মন্থরা সে
জননীর স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে আঘাত দিতে গেল। মন্থরা জানি
এই তাহার অমোঘ অস্ত্র। কারণ, দাসী পরামর্শ দিয়া কৈকেয়ী
এমনি গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, ভরতকে শৈশবাবধি নিজ পিত্র
লয়ে রাখিয়া তবে কৈকেয়ী দেবী সুখে বিশ্রাম করিতেন। শ
শত সপত্নীপুরে ভরতের পিত্রালয়ে থাকা যে নিশ্চয় বিপদজন
দাসীর পরামর্শে কৈকেয়ী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সে
পরামর্শানুযায়ী এখন রামরাজত্বে ভরতের যে প্রাণনাশে
বিলক্ষণ সম্ভাবনা, মন্থরা তাহাই কৈকয়ীকে অনায়া
বুঝাইতে গেল।

তখন কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহা
শরীর লোমাঞ্চিত হইল। হৃদয়ে যেন কি একটা কণ্টক বিঁধিল
কৈকেয়ী নিজ বিশ্বাসানুসারে তর্ক করিতে বসিল। বলি
ভরতও ত ক্রমে রাজত্ব লাভ করিবে। ভরতের প্রতি রামে
ব্যবহার ত কখন বিরূপ নহে; তবে কিসের আশঙ্কা?

মন্থরা রাজদাসী, রাজসংসারে থাকিয়া তাহার রাজনী
শিখিতে অধিক কাল যায় নাই। সুতরাং মন্থরা ভ্রম সংশো
করিয়া বুঝাইয়া দিল, রাম ও তাঁহার পুত্রাদি বিদ্যমান থাকিত
ভরতের রাজ্যলাভের কখন সম্ভাবনা নাই। রাম রাজত্বকা
বরং ভরতের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কৈকেয়ী তখন ফিরিয়া গেলেন। শয্যা হইতে উঠিয়া সিলেন। উঠিয়া মহা চিন্তিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ন্থরা, উপায় ?

মন্থরা তখন ঠাকুরাণীকে পাইয়া বসিল। যে উপায় ভাবিয়া াখিয়াছিল, একে একে তাহা সমস্তই বলিল। বলিয়া তাঁহাকে তখনই ক্রোধাগারে পাঠাইয়া দিল। মন্থরা জানিত, এখন রাজা শরথ নিশ্চয়ই এই কুহক-জালে পড়িবেন। তিনি এখনি অন্তঃপুরে আসিবেন, আসিয়া রাণীর ক্রোধ অপনয়নার্থ সকলই করিতে স্বীকৃত হইবেন, রাণী কিছুতেই টলিবার পাত্রী নহেন। পুত্রবৎসলা ভরতের কল্যাণার্থ এমনি বাঁকিয়া বসিবেন, যে কিছুতেই তাহাকে কেহ টলাইতে পারিবে না। পরের নিগ্রহে তাঁহার মন গলিবার নহে। পরের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইবার নহে। পাষাণী বুকে পাথর বাঁধিয়া নিশ্চয় রামকে বনবাসে পাঠাইতে পারিবেন। এ যদি মিথ্যা হয়, তবে মন্থরার কৈকেয়ী মিথ্যা। মন্থরা যাহা ভাবিল, তাহাই ঘটিল।

কুটিলা রাজদাসীর আদর্শ।

রামায়ণে এই মন্থরার চিত্র অতি প্রগাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। অতি অল্পকালে মন্থরার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই অল্প কাল মধ্যে তাহার চিত্র যেরূপ বর্ণগৌরব লাভ করিয়াছে, আর কোন চিত্রে সেরূপ হয় নাই। কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান লইয়া সীতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মন্থরার চিত্র এক দিনের ঘটনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার কোন রাজরাণীর

চিত্র তত উজ্জ্বল নহে, যত উজ্জ্বল মন্থরার চিত্র। কৈকেয়ী মন্থরার বর্ণরাগে হীনপ্রভ। কৌশল্যা এবং সুমিত্রার চিত্র তদপেক্ষাও দীন। মন্থরা যখন বর্ণরাগে উদ্ভাসিতা, সীতা-চিত্রের তখন রেখাপাত মাত্র হইতেছে। বসন্তকালের সুখময় দেশে উজ্জ্বল বৈশাখী দিনমান-গগনে একদা প্রলয়-মেঘ যেরূপ প্রগাঢ়তমবর্ণে সহসা উদিত হইয়া সকলের নয়ন আকৃষ্ট করে এবং জগৎসংসারের ত্রাসোৎপাদন করিয়া দেয়; অযোধ্যার সেইরূপ হাস্যময় দেশে ও সুখময় কালে, মন্থরা প্রগাঢ় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে একদা সেই রূপ উদিত হইয়া সকলেরই শঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। অযোধ্যাবাসিগণ মন্থরাকে ভুলিতে পারে নাই। মন্থরা সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আজিও সকলের মন অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুকুলে এমত কেহই নাই, যিনি মন্থরাকে ভুলিতে পারেন এবং এমত কেহই নাই, যিনি এই জগৎ-সংসারে অনেক মন্থরাকে চিনিয়া লইতে না পারেন। মন্থরা সকলেরই মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। যে দাসীতে তাহার ছায়াপাত হয়, সে দাসীকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। অযোধ্যাবাসিগণ একদিন ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া এবং আশ্চর্য্য-ভাবে সহসা স্তম্ভিত হইয়া যে কুমন্ত্রণার মূর্ত্তিমতী প্রতিমাকে দেখিয়াছিল, আজিও আমরা তাহার ছায়া-মাত্র-প্রতিফলিত সশরীরী কোন মন্থরাকে দেখিয়া একদা তদ্রূপ ভয়ে ভীত হই। তাহাকে ভয়ে কোটী কোটী নমস্কার করি। বাল্মীকি আমাদের মনে যে মন্থরাকে চিরদিনের জন্য আঁকিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই মন্থরাকে স্মরণ করিয়া দণ্ডবৎ করি। মন্থরা কুটিলা রাজদাসীর আদর্শ-স্থানীয়।

মন্থরা-কাব্য।

রামায়ণে আমরা মন্থরা-চরিত্রের একদেশ মাত্র দেখিতে পাই। মন্থরা কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজান্তঃপুরে কিরূপে আপনাদের সুখ-রাজ্য গড়িয়াছিল, তাহা মন্থরাজীবনের প্রধান অংশ। কিন্তু এ চিত্র রামায়ণে ফুটান নাই। সেই সম্পদ রক্ষার্থ মন্থরা কি করিয়াছিল, রামায়ণে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্থরা-জীবনের এই দুই অংশ একত্র করিলে তবে মন্থরা-চরিত্র সম্পূর্ণ হয়। রামায়ণের যাহা বিষয়ীভূত হয় নাই, বাল্মীকি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অন্য কোন কবি তাহা গ্রহণ করিয়া একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন। রামায়ণে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে অভিপ্রায়ে রামায়ণ রচিত, সেই অভি-প্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কবি যে কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, মন্থরা তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। রাবণবধরূপ মহাব্যাপার ঘটাইবার নিমিত্ত কাব্যকল্পনার যে আয়োজন হইয়াছে, মন্থরা তাহার সূত্রপাত করিয়া দিল। পাপরূপিণী মন্থরা যাহা আয়োজন করিয়া দিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, অযোধ্যার রাজ-ধামে যে ধর্ম্মের শিক্ষা হইত—রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র যে শিক্ষাফলের অবয়বী কল্পনা সেই ত্যাগ-পথানুষ্ঠানের—সেই কর্ত্তব্যসাধন-ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিশিষ্ট সুযোগ ঘটিল। এক সত্যপালনার্থ, রাজা দশরথ কি, না ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পুত্র গেল, হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইল, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হইল। কৌশল্যা ও সুমিত্রা কেবল পতি-শুশ্রূষার্থ স্নেহময় পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন। সীতা কেবল পতিসেবার্থ রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে

গেলেন। লক্ষ্মণও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃ-রক্ষার্থ বন-বাসে গেলেন। আবার, যার জন্য এত কাণ্ড ঘটিল, সেই কৈকেয়ী-নন্দন ভরত কি করিলেন? তাঁহার জন্য রাজ্য, সিংহাসন সকলই প্রস্তুত; কিন্তু ভরত কই সিংহাসনে বসিলেন, কই রাজমুকুট ধারণ করিলেন? সে সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান মাত্র করিতে লাগিলেন। এ কি রাজ-সংসার! না মহর্ষির পুণ্যাশ্রম? এরূপ পুণ্যাশ্রম কেবল হিন্দু ক্ষত্রিয়-রাজসংসারেই সম্ভব। যে শিক্ষা কেবল মহর্ষির বন-বাসাশ্রমে প্রতিলব্ধ, তাহা রাজসংসারে কিরূপে দেদীপ্যমান? সেই সংসারপতি রাজা দশরথ, সত্যধর্ম্ম-পালনই যাঁহার মহাব্রত। যে সংসার বশিষ্ঠের দীক্ষায় চালিত, সে সংসার ঋষির আশ্রম না হইবে কেন? যে রাজপুত্র বিশ্বামিত্র মুনির শিষ্য, সেই পুত্রের ত্যাগ-স্বীকারও যে সত্য-ধর্ম্ম-পথেই কেবল পালনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! মন্থরা এই রাজর্ষি-সংসারের মহা-কাব্য প্রকাশ করিয়া দিল। প্রকাশ করিয়া দিল, রাজসংসারেও সত্যপালনার্থ এবং কর্ত্তব্যসাধনার্থ কঠোর ত্যাগ-ধর্ম্ম পালনীয়। রাজসংসারে ও সুখ-সম্পদে যে ত্যাগ-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্। বনে সেধর্ম্মের দৃঢ়তা যত না হয়, রাজসংসারে সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, পরিণামে তাহা ততো-ধিক সুদৃঢ় হইয়া উঠে। কারণ, সুখ-সম্ভোগের মধ্যে এধর্ম্ম সাধিত ও পালিত হইয়া, তাহা এতদূর প্রবল হয়, তাহার শক্তি এত বাড়ে যে, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। যে ত্যাগ-ধর্ম্মের তেজ ততদূর, সেই ধর্ম্মই রাবণবধার্থ নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে। মন্থরা সেই ধর্ম্মের তেজ দেখাইবার আয়োজন করিয়া

দিল। যে ধর্ম্মতেজ রামচন্দ্রে নিহিত,যে দুর্দ্দম্য শক্তি সমস্ত ভারতের বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, মহারণে সমুদ্রে, বানর-রাজ্যে, ও দৈত্য-নিগ্রহে, জয়লাভ করিয়া পাপের মহা রাক্ষসী মায়াকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই শক্তির প্রভূত বল, মন্থরার মন্ত্রণায় প্রকাশিত হইল।

মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। রাজসংসারে লালিত এবং পালিত হইয়া ও প্রভূত ঐশ্বর্য্য এবং সুখ-সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও রাম চিরদিন নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার নির্লেপ ভাব সমস্ত রামায়ণে প্রকটিত। গৃহমধ্যে যেমন বায়ু থাকে, পদ্মপত্রে যেমন বারি থাকে, রামচন্দ্র রাজসংসারে তেমনই নির্লিপ্ত ছিলেন। রাজসুখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই—বাল্যে নয়, যৌবনেও নয়। আর কখন অভিভূত করিবে? যিনি রাজসুখে নির্লিপ্ত, তিনি যে অনায়াসে সে সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? বন ও রাজসংসার তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। তিনি আদর্শ ক্ষত্রিয়রাজ ছিলেন। রাজর্ষি চরিত্র কিরূপ পবিত্র, তাহা রামচন্দ্রই প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি নির্লিপ্ত, ইন্দ্রিয়সুখ যাঁহাকে কখনই মোহিত করিতে পারে নাই,তিনিই রাক্ষসী মায়ার উপর বিজয়ী; তিনিই ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, দশেন্দ্রিয়প্রমুখ দশাননের বিধ্বংসকারী। মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের এই বিশুদ্ধ নির্লিপ্ত ভাব অতি সুন্দররূপে প্রকটিত হয়। এই জন্য মহাকাব্য রামায়ণে মন্থরার স্থান। মন্থরাকাব্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

কাব্য—ভারতচন্দ্র।

ভারতচন্দ্রের রচনাপ্রণালী।

বাঙ্গলাভাষায় কে প্রথম কবিতা-রচনার প্রণালী প্রদর্শ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বঙ্গভাষার পুরাত সাহিত্যসমালোচনায় প্রতীত হয় যে, কবিতার উন্নতির সহি বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধন হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার ক্রমো ন্নতির প্রতিপদ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগের ভাষায় প্রতীয়মান রহি য়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী অপেক্ষা বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাসের কবিতায় অধিকতর বাঙ্গলা কথা ও রচনার প্রাচুর্য দেখা যায়। তৎপরে কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি যে রচনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাশীদাস এবং রামপ্রসাদ সেন তাহা অনেক দূর পরিশুদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত চন্দ্র সেই রচনাপ্রণালীকে উন্নতির চরম সীমায় আনয়ন করি-লেন। তিনি সেই রচনাপ্রণালীর দোষসমূহ অনেক পরিবর্জ্জন করিলেন এবং তাহার যতদূর উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, তাহা সম্পাদন করিলেন। তিনি অদ্যাপি এই রচনাপ্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়া আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রায়-গুণাকরের অনুকারী মাত্র।

পৌরাণিক অথবা স্থানীয় উপন্যাসই এই সকল রচনাপ্রণালীর বিষয়। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীদাস প্রভৃতি লেখকেরা পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনসার

ভাসানকার ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস প্রভৃতি লেখকগণ কেবল স্থানীয় উপন্যাস অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন। এই সমস্ত উপন্যাস অবলম্বন করিয়া রসবর্ণন এবং রসোদ্দীপন করাই কবিদিগের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সুন্দর অলঙ্কৃত ভাষায় তাঁহারা এই রসবর্ণনা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সরল ও চলিত শব্দপ্রয়োগ, তাঁহাদিগের ভাষার একটা প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে তথাপি তাঁহাদিগের কবিতায় বৃহৎ বৃহৎ কর্কশ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। তাঁহাদিগের চেষ্টা ছিল, যাহাতে তাঁহাদিগের ভাষা সুললিত, মৃদু, মধুর এবং সুশ্রাব্য হয়। তাঁহাদিগের এরূপ শ্রুতিমধুরতা ছিল যে, কবিতার অনুপযোগী কঠিন শব্দ সকল তাঁহারা অনায়াসে নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের কবিতায় তিন ও দুই অক্ষরের শব্দ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচুর। স্বরচিত কবিতাকে সমলঙ্কৃত করিবার জন্য তাঁহারা তাহাতে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিতেন। বাস্তবিক তাঁহারা কাব্যভাষার শিল্পরচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শব্দালঙ্কার তাঁহাদিগের কবিতার প্রধান গুণ। তাঁহাদিগের পদ সকল অনায়াস-প্রসূত হইত। আধুনিক কবিতার ন্যায় তাঁহাদিগের কবিতাবলি শ্রমসম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। এই কবিতাবলি এত সুমধুর ও প্রসাদ-গুণ-সমন্বিত যে সহজেই কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে।

কিন্তু তাঁহারা কেবল শব্দদ্বারা আমাদিগকে মোহিত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহাদিগের কাব্যে অর্থালঙ্কারও প্রচুর পরিপরিমাণে পাওয়া যায়। যে স্থলে যে প্রকার রসোদ্দীপনার আবশ্যকতা, তাহা তথায় সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

রসবর্ণনার উপযোগী দৃশ্য সকল কল্পিত হইয়াছে। যে দৃশ্য যখন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কল্পনা সেই দৃশ্যেরই উপযোগী ও স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে। অভৌতিক দৃশ্যে অভৌতিক কল্পনা, এবং মানুষ দৃশ্যে মানুষী কল্পনা। এরূপ স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা রস-বর্ণনার একটী প্রধান অঙ্গ। এরূপ কল্পনা বর্ণনীয় কাব্যাবলিতে প্রচুররূপে পরিদৃষ্ট হয়।

এই রচনাপ্রণালীর প্রধানত্ব ভারতচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন। উত্তম কবিতা-রচনা পরীক্ষা করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। কবিতার ছন্দোগুলি তদ্বিষয়োপযোগী কি না এবং পদাবলি অলঙ্কার-সম্পন্ন কি না? ভারতচন্দ্রের কবিতাকলাপ নিশ্চয় এরূপ পরীক্ষাসহ। তিনি অযথাস্থানে কোন ছন্দ সংযোজিত করেন নাই। বর্ণনীয় রসের উপযোগী ছন্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে কাহারও যদি সংশয় থাকে, তিনি একবার রামপ্রসাদ-সেন-কৃত বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া দেখুন। আমাদের অভিপ্রায় বিশদ করিবার জন্য নিম্নে উভয়েরই গ্রন্থ হইতে সদৃশ স্থল উদ্ধৃত করিলাম।

ভারতচন্দ্র :—"প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা,
শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে নয়নের জলে

কপালে কঙ্কন হানে,
অধীরা রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥"
ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ :--"দয়িত-দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজমুখী,
দুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, নীহারা খুচয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি, ঘর্ম্ম ছুটে ॥"
ইত্যাদি।

বিদ্যার দুঃখ যেমন গভীর, ভারতচন্দ্রের খেদোক্তিও তেমনি মৃদুগতি এবং ছন্দটিও বিশিষ্টরূপে ইহার উপযোগী হইয়াছে। ত্রিপদীর পদাবলি তত মৃদুগতি নহে। ভারতচন্দ্রের পদাবলি কেমন সরল ও মধুর ভাষায় লিখিত! রামপ্রসাদ সেনের কবিতায় সহজে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট, যেখানে সহজে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট, সেখানে বর্ণনার আস্বাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকে না।

রস-বর্ণনা।

ভারতচন্দ্রের কবিতা রচনায় যেমন নিপুণতা, রসবর্ণনায়ও তদ্রূপ পারদর্শিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্দ্রের আদিরসবর্ণন যেমন সুমধুর, এরূপ অন্য রসবর্ণন নহে। আমরা তৎসম্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে, যাহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা বোধ হয় ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তৎকৃত অন্নদামঙ্গল সেরূপ মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করেন নাই। যদি সেরূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়া

থাকেন, তাহা হইলে এই বলিব যে, তাঁহাদিগের রুচি আদিরসে যেমন প্রমত্ত হয়, অন্য রসে বোধ হয় তেমন হয় না। কিন্তু আমরা বিদ্যাসুন্দর হইতেই দেখাই, একটি রসগর্ভ সুন্দর দৃশ্য কেমন স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ তাহা আদিরস-বিশিষ্ট নহে।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরী-বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ঢাক,
চমকে সকল পুরজন॥"

ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের আদিরস-বিষয়ক কোন পদাবলির সহিত এই কয়েক পংক্তির তুলনা কর, নিশ্চয় এই পংক্তিচয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাতে মনে যে দৃশ্য উদিত হয়, তাহা ক্রোধের স্বাভাবিক দৃশ্য। সহসা আমাদিগের সম্মুখ দিয়া যেন বিদ্যুৎ-অগ্নি ঝলসিয়া গেল। ক্রোধ যেন দিগম্বর বেশে, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সহসা মেদিনী কাঁপাইয়া গেল। এই দৃশ্যে ক্রোধের সুন্দর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা সন্দেহ করি, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি এরূপ ক্রোধের দৃশ্য দিয়াছেন কি না? পাঠকগণ! এস্থলে কবি-রঞ্জনের বর্ণনা দেখুনঃ—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোমুখে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা
নিরানন্দ গতিমন্দ জিনিয়া বরটা।"

কবিরঞ্জনের রাণী শান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার কোপভাব প্রগাঢ়তর এবং ভাবনায় প্রশমিত হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে রাজার নিকট উপনীত হইতেছেন। কিন্তু বিদ্যাকে সহসা গর্ভবতী দেখিলে রাণীর হৃদয়ে প্রথমে যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্দ্র সেই প্রজ্বলিত ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল বিগত হইলে এই ক্রোধ ক্ষুভিত হইয়া যেরূপ শান্তপ্রকৃতি ধারণ করে, কবিরঞ্জন সেই ক্ষুভিত ক্রোধেরই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তত দিন বিগত হয় নাই, যাহাতে সেই কোপভাব ক্ষুভিত হইয়া পড়ে। ভারতচন্দ্রকে সেই জন্য এই স্থলে কবিরঞ্জন হইতে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বিদ্যার যে আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র করুণরসও কেমন উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিতে পারিতেন। কোটালের উৎসব-বর্ণনও কি চমৎকার! ভারতচন্দ্রের আদিরসগর্ভ কোন্ পংক্তিচয় তাহার সহিত তুল্যমূল্য হইতে পারিবে?

কল্পনা ও রস।

ভারতচন্দ্রের কোন জীবনীলেখক বলেন, "ভারতচন্দ্র-প্রণীত কাব্যমধ্যে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না।" ভারতচন্দ্র রায়ের কল্পনাশক্তি ছিল কি না, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে তাহা প্রকাশিত আছে। অন্নদা-মঙ্গল, মানসিংহ প্রভৃতি কাব্যে কল্পনার প্রাচুর্য্যের অভাব না থাকিলেও আমরা বিদ্যাসুন্দর-কাব্য গ্রহণ করিতেছি এই জন্য যে, তাহা লোকে অধিকতর পরিচিত এবং অধীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ছেলে, বুড়া যুবা, মেয়ে

পুরুষ প্রায় এমত কেহই নাই যিনি পড়িতে পারিলে, একবার বিদ্যা সুন্দর না পড়িয়াছেন, তাই, সর্ব্বজন-পরিচিত বিদ্যাসুন্দর হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মূল বিদ্যাসুন্দর হইতে অনেক বিভিন্ন। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেরও সহিত তুলনা করিলে, তাহার ঘটনাপরম্পরায় অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। কবিরঞ্জন-বর্ণিত ঘটনার পরিবর্ত্তে ভারতচন্দ্র যে সমস্ত ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ কবিত্বেরই পবিচয় হইয়াছে। এ বিষয় বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে হইলে হীরা-মালিনীর চরিত্র-বর্ণনই গ্রহণ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দরে যেমন হীরা-মালিনীর চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ কাহারও নহে। বলিতে কি, কাব্যোল্লেখিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের চরিত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতের হীরা-মালিনী প্রায় সম্পূর্ণ-চরিত্র। ইহাই বিদ্যাসুন্দর উপন্যাসের একমাত্র চরিত্র। মধ্যবর্ত্তিনীর এরূপ চরিত্র আমরা কোন কাব্যে প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এই চরিত্রটী যে সম্পূর্ণ ভারতের, এমত কথা বলিতে পারি না। এই চরিত্রটী রামপ্রসাদ সেন হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ সেনের মালিনী ভারতচন্দ্রের মালিনী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। রামপ্রসাদ সেন যে মালিনীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, অনেক স্থলে সেই চরিত্রকে সংশুদ্ধ করিয়া লইয়া এবং তাহাতে শেষবর্ণসংযোগ দ্বারা ভারতচন্দ্র তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন।*

* একথা ১২৮১ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের "আর্য্যদর্শনে" বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বিদ্যা ও সুন্দরের সামাজিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎ-পরেও কবিরঞ্জন উপন্যাসকে বিস্তৃত করিয়া আপন নায়ক নায়িকাকে স্বর্গে না তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভারতের গ্রন্থে এরূপ অস্বাভাবিক দৃশ্য স্থান-প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার নায়ক নায়িকার চরিত্র-বর্ণনে এমত কোন বিশেষ গুণের ব্যাখ্যা নাই, যে জন্য রামপ্রসাদের মত তাহাদিগের স্বর্গারোহণ-বর্ণনও সম্ভবপর হইতে পারে। যেথানে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের কল্পনা সমাপ্ত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র সেইখানেই তাহাকে সমাপ্তি দিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের গোপনীয় মিলনের পর বিদ্যার গর্ভ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সে কালের বৃত্তান্তে রামপ্রসাদ কোন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই স্থলীয় উপন্যাসভাগ নীরস বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্র কেমন কৌশল করিয়া, এই স্থলে সন্ন্যাসীর গল্পটি সংযোজনপূর্ব্বক উপন্যাসের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন! সুন্দরই সেই সন্ন্যাসী হওয়াতে কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মিলন-বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত ভারতীয় হীরার নিকট সুগোপন থাকাতে, তাহার উপন্যাসের উপরি-উক্ত স্থলের বৈচিত্র্য-সংঘটনের বিশেষ উপযোগিতা ঘটিয়াছে। এই সমস্ত কল্পনায় কি ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকাশ হয় নাই? তাঁহার কি কল্পনা-শক্তির পরিচয় হয় নাই? যে সমস্ত ঘটনা-যোজনায় কাব্য-বর্ণিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ভাব উত্তমরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, এবং পাঠকের মনে সম-ভাবের উদ্দীপন করে, এমত সকল ঘটনা-যোজনা করা কবি-কল্পনার কার্য্য। সন্ন্যাসীর গল্পটী সংযোজিত হওয়াতে, মালিনীর কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাতাশঙ্কা, সুন্দরের প্রতি বিদ্যার প্রেমানুরাগ,

সুন্দরের রহস্য-প্রিয়তা ও বিদ্যার প্রণয়-পরীক্ষা এবং রাজা ও রাণীর হৃদয়-ভাব—এই সমস্ত বিষয় একদা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সাধিত হওয়াতে সেই স্থলের উপন্যাসভাগকে অধিকতর মনোহর করিয়াছে। এবম্বিধ কল্পনা-দ্বারা যদি কল্পনাশক্তির পরিচয় না হয়, আমরা জানি না, কিসে হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি,রসবর্ণনায় ভারতচন্দ্রের বিলক্ষণ দক্ষতা লক্ষিত হয়। রসের উদ্দীপন এবং সেই উদ্দীপন দ্বারা হৃদয়কে বিমুগ্ধ ও আর্দ্র করাই কাব্যের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানশাস্ত্র এক দিকে মানবের যেমন জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত আছে, কাব্য তেমনি অপরদিকে মানবের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া আছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে সত্য আনিয়া দেয়, কাব্য সেই সত্যের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞান মনকে আলোকিত করে,কাব্য হৃদয়কে প্রমত্ত করে। কাব্য কিরূপে আমাদিগের হৃদয়ভাবকে বিচালিত করে? কাব্য,ভাবেতে কল্পনা মিশায় এবং কল্পনাতে ভাব মিশায়। কাব্য, এমত সকল কল্পনার সৃষ্টি করে, যাহাতে সেই কল্পনা-প্রসূত ভাবের বিকাশে মানব-মন বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই ভাবদ্বারা কাব্য মানব-হৃদয়কে বিচালন ও প্রমত্ত করে। কল্পনাশক্তি কবির এই জন্য প্রধান সহায়। যে হেতু, কল্পনা-শক্তির সৃষ্টি যেমন মানব-হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, এমত আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। এই সৃষ্টি দ্বারা কবি, মানব-হৃদয়ে এক সময়ে এক ভাবের উদ্দীপন করেন, আবার অপর কল্পনা দ্বারা সেই ভাব হইতে হৃদয়কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই প্রকার ভাবোদ্দীপনকেই রস কহে।

কল্পনা, রসসঞ্চারের প্রধান সাধন; ছন্দ তাহার অপ্রধান সাধন। কল্পনা, রসের বৈচিত্র্য সাধন করে, ছন্দ কল্পনায় বৈচিত্র্য বিধান করে। ছন্দ,কল্পনাকে কখন গুরু, কখন লঘু, কখন উগ্র, কখন মৃদু, করিতেছে; এবং কল্পনা, কখন হৃদয়ে গভীর, কখন প্রমোদকর, কখন কঠিন, কখন তরল ভাব সঞ্চার করিতেছে। ছন্দ কল্পনার ভাবকে কখন উঠাইতেছে, কখন নাবাইতেছে, কখন নাচাইতেছে, কখন নানা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিতেছে। যেখানে যেরূপ করা আবশ্যক, তাহা করিতেছে। কাব্যে ছন্দের প্রভাব এতই অধিক। ছন্দের জোরে কল্পনার রস বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই গুণ প্রধাণত লক্ষিত হয়।

হীরা-মালিনীর চরিত্র শেষ হইলে পর বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রকৃত পক্ষে আরব্ধ হইল। এই আখ্যায়িকার পূর্ব্বভাগে যেমন আমরা কেবল মালিনীর চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, ইহার পুরোভাগে তেমনি আমাদিগের হৃদয় নানা রসে প্রমত্ত হইয়া উঠে। আমরা চরিত্র বিস্মৃত হই, কেবল ভাবের প্রাচুর্য্যে মন পরিপূরিত হয়। নায়ক নায়িকার প্রেম হইতে রাণীর কোপভাব, রাণীর কোপভাব হইতে রাজার প্রচণ্ড রোষানল, রাজার রোষানল হইতে কোটালের আস্ফালন ও উল্লাস, কোটালের উল্লাস হইতে মালিনী ও সুন্দরের নিগ্রহ ও নির্যাতন, তৎপরে নায়ক নায়িকার প্রতি অনুকম্পা ও তাহাদিগের সুখময় মিলন—বিদ্যাসুন্দর পাঠে এই সমস্ত বিবিধ ভাবে হৃদয় পুলকিত এবং বিচলিত হইয়া উঠে।

ভাবের বৈচিত্র্য এই আখ্যায়িকাভাগের একমাত্র লক্ষণ নহে। ভাবের পরিবর্ত্তন এবং পরিণতিও বিশেষ দ্রষ্টব্য। ঘটনা

বিশেষের উদয়ে হৃদয়-মধ্যে কোন একটী বিশেষ ভাব প্রাধান্য লাভ করে। সময় এবং অবস্থাভেদে এই ভাবের ক্রমশঃ ব্যত্যয় বা পরিবর্দ্ধন অথবা পরিণতি ঘটে। যে ভাব প্রাধান্য লাভ করে, তাহা স্থায়ী ভাব, এবং তদধীন ভাবগুলি সঞ্চারী ভাব। বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর মনে যে স্থায়ী কোপভাব উদ্রিক্ত হইল, তাহা বিবিধ সঞ্চারী ভাবে পরিণত ও পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ সেই সংবাদ শুনিবামাত্র দেখুন রাণী কি করিলেনঃ—

"শুনি চমকিয়া, চলে শিহরিয়া,
মহিষী যেন তড়িৎ।
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে,
উত্তরিলা পাঠরাণী।"

রাণীহৃদয়ের এই চিত্রখানি কি স্বাভাবিক! "শুনি চমকিয়া, চলে শিহরিয়া"—গর্ভসংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর হৃদয় সহসা চমকিয়া উঠিল; পাছে সংবাদ সত্য হয় ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া তড়িদ্‌গতিতে বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যখন সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন, তখন দেখুন রাণীর কি ভাব :—

"গালে হাত দিয়া, মাটিতে বসিয়া,
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
কহে, ভালে কর হানি॥"

এই স্থলে রাণীর হৃদয়ভাব যেন স্ফটিকবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। রাণীর সন্দেহ অপনীত হইল। সন্দেহ নিরাকরণের সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহার কোপভাব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন কি বলিতেছেন শুনুন :—

"ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী,
পাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, হরিয়া কাহায়,
আনিলি ডাকি, ডাকিনী॥"
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে,
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়,
কেমন কুটনী সে বা॥
না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে এ কাজ,
করিলি খাইয়া মোরে।"
ইত্যাদি।

বিদ্যার প্রতি কিয়ৎক্ষণ তিরস্কারের পর যখন এই কোপভাব একটু প্রশমিত হইয়াছে, রাণীর নিজের গায়ে যখন বাড়ি পড়িয়াছে, যখন রাণী বুঝিয়াছেন, এ গরল ফেলিবার যো নাই, খাইবারও যো নাই, গলায় ধরিতেই হইবে, তখন তাহা ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত মিশ্রিত হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন :—

"রাজার ঘরণী, রাজার জননী,
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ, সব হৈল বাদ,
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা—ছলে, যদি কেহ বলে,
তখনি খাইব বিষ।

প্রবেশিব জলে, কাতী দিব গলে,
পৃথিবী!—বিদায় দিস॥"
ইত্যাদি।

অনন্তর বিদ্যার মিথ্যা জল্পনায় রাণীর কোপভাব আরও উদ্রিক্ত হইল। তখন তাঁহার রাজার প্রতি সেই ভাব নিপতিত হইল। রাজার প্রতি কোপোজ্জ্বলিতা রাজ্ঞী নৃপতির শয়নমন্দিরে কি ভাবে গমন করিলেন ও তথায় তাঁহার ঘন ডাকে সকলে কেমন চমকিয়া উঠিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু রাজার নিকট যখন রাণী উপনীত হইয়াছেন, তখন বিদ্যার প্রতি জননীর স্নেহ স্বাভাবিক ভাবে উদ্রিক্ত হইল। এজন্য তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন :—

"কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুণ প্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে,
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
* * * *
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ,
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।"
ইত্যাদি।

উল্লিখিত কতিপয় দৃশ্যে রাণীর যে কোপভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে! এই সমুদায় কল্পনায় কেবল রাণীর চিত্তচাঞ্চল্য চিত্রিত হইয়াছে এমত নহে, এতদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়ও নিশ্চিয় সমভাবে এবং সম-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। তাঁহার হৃদয়ে রাণীর কোপভাব অঙ্কিত হইয়া যায়। রাণীর সমুদায় চিত্রদ্বারা পাঠকের মনে যে একটী স্থায়ী

ভাবের উদয় হয় তাহাই উদ্রিক্ত করা কবির উদ্দেশ্য। এই ভাব প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইলে কবিকে অন্যবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিতে হয়। কল্পনার প্রাবল্য-নিবন্ধন যে পরিমাণে হৃদয়ে ভাবেরও প্রাবল্য হয়, সেই পরিমাণে ভাবান্তর ঘটে। পাঠক এক সময় বিদ্যসুন্দরের প্রণয়ভাবে বিমুগ্ধ ছিলেন; যখন বিদ্যার গর্ত্ত হইল, তখন অপর দৃশ্য সকল তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া অন্যবিধ ভাবোদয় সংঘটন করিল। এই এক প্রকার ভাব হইতে ভাবান্তরে হৃদয়কে প্রত্যাবর্ত্তিত করার নাম ভাবের বৈচিত্র্য-সাধন; এবং এক ভাবের নানাবিধ সঞ্চারী অবস্থা-ঘটিত রূপান্তর প্রদর্শন করাকে ভাবের পরিণতি কহে। এই দ্বিবিধ রসবর্ণনাতেই ভারতচন্দ্র সুনিপুণ ছিলেন।

স্থায়ী রস ও অধ্যয়ন-ফল।

ভারতচন্দ্র যখন যাহা বর্ণন করিতেন, তাহা স্বাভাবিক; তাহাতে অচিরাৎ হৃদয়ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাঁহার ভাববর্ণনা পড়িবার সময় আমাদিগের স্মরণ থাকে না যে, আমরা কিছু অধ্যয়ন করিতেছি। এই বর্ণনাসমূহ এরূপ সরল অথচ অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে বিরচিত যে, পাঠ-মাত্রেই তদ্বিষয়ক হৃদয়-ভাব আমাদিগের মনে সহজেই প্রতিভাত হইয়া পড়ে। পড়িবার সময় মনে হয়, আমরা যেন একখানি চিত্র দেখিতেছি। এইরূপ এক একটী ভাবসঞ্চারী বর্ণনা এক একটি কল্পনা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানোদ্রেক অথবা জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন করা কবি-কল্পনার তত উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু রসের সঞ্চার করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতচন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রমাণস্বরূপ

আমরা তদ্বিরচিত মানসিংহ-কাব্য হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে, সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
*   *   *   *   *   *
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্য, রস লয়ে॥"

বাস্তবিক, ভাবের উদ্রেক করা, এবং অন্যূন কিছুকালের জন্য হৃদয়ে ভাবের স্থায়িত্ব বিধান করা কবিকল্পনার উদ্দেশ্য। যে কাব্যে যতগুলি ও যত প্রকার কল্পনা থাকে, তৎ পাঠে ততগুলি ও ততপ্রকার ভাব উদ্রিক্ত হয়। সেই সমস্ত ক্রমসঞ্চারিত ভাব পরিশেষে যে স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত ও পরিণত হয়, তাহাই রস ও কাব্য-পাঠের ফল এবং তদ্দ্বারাই কাব্য-বিশেষের পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-কাব্য তাঁহার অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতচন্দ্র নিজ কথাতেই ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের অধ্যয়ন-ফল অতি জঘন্য। সেই কাব্যে ঐন্দ্রিয়িক প্রেম-কল্পনা যে স্থায়ী রসের সঞ্চার করে, তাহাই অধ্যয়ন-ফলস্বরূপ শেষে দাঁড়াইয়া যায়। কারণ, সে কল্পনার রস গ্রন্থের উত্তর উত্তর কল্পনা-দ্বারা মন্দীভূত বা প্রতিহত হয় নাই। পরবর্ত্তী ঘটনা সকল সেই গোপনীয় প্রেমেরই প্রতিফল মাত্র। একই স্থায়িভাব ও রস বরাবর চলিয়াছে। সেই রসেই কাব্য প্লাবিত,সুতরাং তাহা পাঠকের চিত্তকেও প্লাবিত করে। অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ তাহাই স্থায়িভাবরূপে পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। সে অঙ্কন কিছুতেই অপনীত হয় না। যে অঙ্কনে বিদ্যাসুন্দর পাঠকের মনে চিরদিন বিদ্যমান

থাকে, তাহাই তাহার অধ্যয়নফল। এই অধ্যয়ন-ফল নিতান্ত নিন্দনীয়।

ভারতচন্দ্রের কবিত্ব ও প্রতিভা।

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি লইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। অনেকে তাঁহাকে কবি বলিয়াই স্বীকার করেন না। মনোহর এবং চমৎকার পদবিন্যাস করিবার শক্তি ব্যতীত তাঁহাকে অন্য কোন উচ্চতর শক্তির গৌরব প্রদান করিতে কেহ কেহ প্রস্তুত নহেন। ভারতচন্দ্রকে যাঁহারা কবি বলেন না, তাঁহারা অনেক কবিকেই কবি বলিবেন না। তাঁহাদিগের মতে ভবভূতি, কালিদাস এবং তদনুসঙ্গিগণই কবি। যে অর্থে ভবভূতি এবং কালিদাস কবি, সে অর্থে নিশ্চয় ভারত-চন্দ্র কবি নহেন। ভবভূতি এবং কালিদাসের কবিত্ব ভারতচন্দ্রে পরিদৃশ্যমান নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিত্বও ভবভূতি এবং কালিদাসে দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক, ইহাঁদিগের কবিত্ব বিভিন্ন প্রণালী-গত ছিল। ভবভূতি ও কালিদাস যে শ্রেণীর কবি ছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে তাঁহারা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন। ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর কবি, সে শ্রেণীতে ভারতচন্দ্র নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। এক শ্রেণীর কবিত্ব, অপর শ্রেণীর কবিত্ব অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীতে যাঁহারা নিম্নপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি অপেক্ষা, হীনশ্রেণীর উচ্চতম-পদগ্রাহিদিগের কবিত্বশক্তির গরিষ্ঠতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাঁদিগের কবিত্বশক্তি বিভিন্নপ্রকৃতিক, ইহাঁ-দিগের কাব্য বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ইহাঁরা কাব্য-সাহিত্যে এক বিভিন্ন

আদর্শ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শের যাহা গৌরব এবং গুণ, তজ্জন্য ইহাঁরা নিশ্চয় পূজ্য এবং সহৃদয় জনগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

যিনি স্বহৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভাবকতাদ্বারা বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েন, যিনি স্বকীয় অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব-অনুভাবকতা শক্তি দ্বারা প্রকৃতির ঔদার্য্য, মহত্ত্ব এবং প্রকাণ্ডতায় চমৎকৃত হয়েন, স্বকীয় হৃদয়ের ভাবপ্রাবল্য হেতু, মানবীয় এবং বাহ্য-প্রকৃতির প্রবলভাবসম্পন্ন দৃশ্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি জন্মে, তাঁহারা সকলেই উচ্চদরের স্বাভাবিক কবি। তাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া জগৎকে পরম সুন্দর ও রমণীয় বেশে সজ্জিত করেন, প্রকৃতির মহত্ত্বে পূর্ণ হইয়া ত্রিসংসার নিজ উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ করেন, এবং প্রকৃতির ভাববেগ অনুভব করিয়া ত্রিজগৎ নিজ ভাবে কাঁপাইয়া তুলেন। এইরূপ কবি কালিদাস, এইরূপ কবি ভবভূতি এবং এইরূপ কবি লর্ড বাইরণ। ইহাঁরা সকলেই উচ্চদরের কবি। ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক এক গুণে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের সৌন্দর্য্য, ভবভূতির উদাত্তভাব এবং বাইরণের ভাববেগে কে না বিচলিত হয়? বাল্মীকি, ব্যাস, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ এই ত্রিবিধ গুণেই একদা ভূষিত ছিলেন। তাঁহাদিগের কাব্যে আমরা প্রকৃতির প্রভাব সম্যক্ অনুভব করি। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও রমণীয়, যাহা কিছু উদাত্ত ও মহান্, যাহা কিছু ভাবসম্পন্ন ও মোহকরী, তাঁহাদিগের কাব্যে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা প্রকৃতির সরলতা, সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব—এই সমস্ত ভাবই চমৎকৃত হইয়া দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া সেই

সরলতা, সৌন্দর্য্য ও মহত্বে এতদূর পুলকিত হইয়াছেন যে, যে তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহাকেই সেই ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির প্রভাব, সুধু ইন্দ্রিয়ে নয়, জ্ঞানে ও হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, এবং ভাববেগ আবার জগন্ময় ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাব সকল লক্ষ্য করিয়াছেন। মানবের সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব স্থানে যে নিত্য অবস্থা ও ভাব, তাহাই তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কবিত্ব শক্তির প্রভাব সকলেই স্পষ্টাভিধানে অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ভারতচন্দ্রকে এরূপ কবিত্ব-শক্তির গৌরব দিতে প্রস্তুত নহি।

ভারতচন্দ্র প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। তিনি প্রকৃতির মুখচ্ছবি কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিয়া দেখিতেন। মনে করুন, ভবভূতি, কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র এই তিন জনেই দেশভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন। যেখানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা গগন ভেদ করিয়া মানবদৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেখানে বৃহৎ অরণ্যানী হরিদ্বর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেখানে জল-প্রপাত ভীষণরবে বজ্রনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, যে কোন দৃশ্যে স্বভাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে, ভবভূতি সেই স্থলে ক্ষণিক স্থিরদৃষ্টিতে ভাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন, এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের এমত চমৎকার চিত্র-সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে মানবমনে তাঁহার স্বকীয় হৃদয়ভাবের সমভাব উদ্বোধিত করিয়া দিবে। কালিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পর্ব্বতমালার রমণীয় প্রদেশ, অরণ্যানীর কুসুমিত তরু ও সুন্দর লতাকুঞ্জ,

মুক্তাসদৃশ নির্ঝরের বারিবিন্দু এবং যাহাতে স্বভাবের রমণীয়তা, মাধুরী ও লাবণ্য অনুরঞ্জিত আছে, তাহাই ভাবুকের মত কবির নয়নে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন এবং সেই সমস্ত দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নিজ কাব্যে বিকশিত করিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র কি করিবেন? তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথায় একটী শোভনীয়া নগরী আছে, কোথায় উদ্যানশোভা সৌধরাজির সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধন করিতেছে এবং কোথায় তীর্থধামের তটিনীতীরে দেবমন্দির-শ্রেণী চন্দ্রপ্রভায় বিরাজিত আছে তিনি কাঞ্চীপুর ও বর্দ্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া বর্দ্ধমানের শোভা চিত্রাঙ্কিত করিবেন। তাঁহার কৈলাসধাম, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণের বাসভূমি। তাহা কোটি-শশি-শোভায় পরিশোভিত। সেখানে সকলেই সুধাপান করে। সেখানে ত্রিপুরারি মণিময় বেদীর উপর উপবিষ্ট। সেখানে কল্পতরুতে সুবর্ণময় ফল ফলে। দেশ-পর্য্যটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই এক এক বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। এই তিন জনের চিত্র একত্র করিলে তবে আমরা পর্য্যটিত দেশের সমগ্র চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্য-সংসারেও এইরূপ।

কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্য যেমন বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। যে তাপসকন্যা শকুন্তলা জন্মাবধি বনবাসিনী এবং যিনি সংসারাশ্রমের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞা, সেই শকুন্তলার হৃদয়-সারল্য,—যে শকুন্তলা প্রেমানুরাগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুন্তলার নির্ম্মল প্রেমাবেগ,—যে শকুন্তলা কখন জনসমাজের কুটিলতা এবং নৃপতিগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার অবগত নহেন, সেই

কুন্তলার বিশ্বস্তহৃদয়তা,—এবং যে শকুন্তলা কুরঙ্গশিশুর স্নেহে ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছেন, সেই শকুন্তলার কোমল প্রকৃতি,—কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারিতেন না। ভারতচন্দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজপ্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজমহিষীবেশে, রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের উন্মত্ততায় অরণ্যাশ্রম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা পৃথিবীর কুটিলতা ও লোকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন শকুন্তলা কেমন দুষ্মন্তের নিকট তাপসকুমারী বনবাসিনী সাজিয়া পুনরায় আলবালে জল সেচন করিতে করিতে দুষ্মন্তের মনোহরণ করিতেছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই দেখাইতেন। ভারতচন্দ্র দেখাইতেন, কালিদাসের নিরলঙ্কৃতা শকুন্তলা এখন রাজমহিষীবেশে কেমন মনোহরা হইয়াছেন, এখন রাজপরিজনবর্গের কুটিলতায় বন্য সরলতা কেমন বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তিনি হয় ত সপত্নীর মমতা-জাল ভেদ করিতে শিক্ষা করিতেছেন, দুষ্মন্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঞ্ছনা করিতেছেন এবং কখন তাঁহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতেছেন। এখন আর সে শকুন্তলা নাই। বনবাসিনী বালিকা এখন রাজমহিষী ও গৃহিণী হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি মানব-প্রকৃতির অনিত্য ভাব ও বিশেষ ধর্ম্মসকল উত্তমরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

ভারতচন্দ্র মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা প্রদর্শন করে
নাই। নানাবিধ অবস্থায় মানবপ্রকৃতি যেরূপ কার্য্য কর
মানবের হৃদয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা ভারতচন্দ্রে
বর্ণনীয় ছিল না। নৃপতি যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে ভিখারী
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই ভিখারীর অবস্থা ও হৃদয়ভাব বর্ণ
করা ভারতচন্দ্রের বিষয় নহে। ভারতচন্দ্র যদি কখন ভিখার
বর্ণন করেন, সে ভিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা নৃপতি
ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাঁহার অন্নদা কখন বৃদ্ধাবেশ
ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্নপূর্ণারূপে আবির্ভূত
হইতেছেন। রাজকুমার কখন সন্ন্যাসী সাজিতেছেন, সন্ন্যাসী
কখন রাজকুমার হইতেছেন। দুরবস্থা ও দুঃখে মানব
প্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিতে
পারিতেন না। তিনি মানবের খেয়াল ও তামাসা, তাহার দ
ও জাঁক জমক, তাহার আড়ম্বর ও বেশভূষা, এই সমস্ত যথায
বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। সুতরা
তিনি রাজা ও বাদসার প্রকৃতি, অভিরুচি, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমত
প্রভৃতির বর্ণনা করিতে আনন্দ পাইতেন। তাঁহার এই সম
বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ। ঐশ্বর্য্যশালী জনসমাজে
যে সমস্ত দোষ ও গুণ এবং তদবস্থ জনগণের প্রকৃতি ও হৃদয়ভা
তিনি অতি চমৎকারভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্ধতন জন
সমাজের ব্যবহার,রীতি ও নীতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন
রাজকীয় কবি হইয়া তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত অবগত ছিলে
এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস এব
ভবভূতিও ত রাজকীয় কবি ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতিভ

ভিন্ন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজসভার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে কল্পনাবলে রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কল্পনা যেন রাজসভা, রাজ-ব্যবহার, রাজধানী, রাজৈশ্বর্য্যের ধূমধাম, খেয়াল ও তামাসা প্রভৃতি রাজাড়ম্বর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র রাজসভা ও তৎপ্রভাব যে প্রকার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিবার সময় অনুমান হয়, যেন ঠিক রাজসভামধ্যে আমরাও উপস্থিত আছি। তিনি দেবসভাকেও মানুষী রাজসভারূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রাজপারিষদগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার, সৈন্যের সমা-বেশ, সৈন্যগণের যাত্রা, দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিষয় ছিল। ঐশ্বর্য্য এবং ধূমধাম সহজেই তাঁহার কল্পনাকে আকৃষ্ট করিত।

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকৃতি এক্ষণে বোধ হয়, অনেক পরিমাণে বিশদ হইয়াছে। যে উচ্চতর শ্রেণীতে ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে শ্রেণীতে আমরা ভারতচন্দ্রকে বসাইতে চাহি না। কিন্তু ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন, তৎপদোচিত সম্মান-লাভে তিনি নিশ্চয় যোগ্য পাত্র।

কাব্য—রামপ্রসাদে।

প্রসাদী প্রতিভা।

পৃথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্থিক কবিতায় রামপ্রসাদের পদাবলী এক অপূর্ব্ব পদার্থ। কোন জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে সেরূপ রত্নরাজি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলির প্রকৃতি ও বিশেষ ধর্ম্ম আর কোন প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। রামপ্রসাদ সেন এক স্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই আপন আপন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লয়েন। তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব ও চিন্তা এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন ভাবে বিকসিত হইয়া পড়ে।

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা অতি তেজস্বিনী ছিল। তাঁহার কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার কল্পনা পার্থিব সুন্দর পদার্থের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই, কোথায় কুসুমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা ও মনোহর শস্যক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া একটী একটী মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাঁহার কল্পনাকে অমনি আকৃষ্ট করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পনা যেন নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, অমনি তাহাকে সাত্বিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; পৃথিবীর সামান্য ধূলিরাশিকেও সুবর্ণে মিশ্রিত করিয়াছে। রাম-

প্রসাদ যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন হৃদয়ের সাত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্রকৃতি কবির চক্ষে কিরূপ দেখায়, তাহাই যদি বিকশিত করা কবিত্বের ধর্ম্ম হয়, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব নাই। রামপ্রসাদের হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ ছিল। রামপ্রসাদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাঁহার হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্ম্মভাব প্রতিফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল অলঙ্কারে তাহা বিভূষিত হইত। যে ক্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ যাবদীয় পদার্থকে তিনি সাত্বিকভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি কনকভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জগৎকে তিনি ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির কর্ণকুহরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতিও তাঁহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল; বিমুগ্ধ হইয়া সেই গান চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। তিনি যাবদীয় সামান্য পদার্থকে ধর্ম্মগান সঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজিও আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্য পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়া উঠি:—

"মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোকঢাকা বলদের মত।

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত ?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দেমা চ'খের ঠুলী, দেখি তোমার অভয় পদ॥
কুপুত্র অনেকেই হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।" *

"মন তুই কৃষি-কাজ জানিস্ না।
এমন মানব জমিন্ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।
অদ্য অব্দ শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না!
এখন আপন ভেবে, যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না।
ওরে, একা যদি না পারিস্ তুই, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।"

রামপ্রসাদের যে প্রকৃতই অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহ তাঁহার জীবনের একটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। তিনি যখ মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কল্পনা ও প্রতিভ অল্পে অল্পে বিস্ফূরিত হইতেছিল। কোন সুধিবর-সম্বন্ধে কথা উল্লিখিত আছে, যে তাঁহাকে যদি স্যালীস্‌বরীর প্রস রিত ক্ষেত্রে পরিবর্জ্জন করা হইত, তথায়ও তিনি যশে পথ খুঁজিয়া লইতেন; রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সেই গাথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদ ঘোর বিষয়ীর জমিদা

* হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, মানুষের চিত্তপুরুষ মায়ামোহে আচ্ছ ও অন্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। এই মোহ না কাটিলে তাহ ভগবদ্দর্শন হয় না। ভগবদ্দর্শনে তাঁহার মায়ামোহ হইতে মুক্তি হয় রামপ্রসাদ সেই মুক্তির প্রয়াসী হইয়া এই গীত বাঁধিয়াছিলেন।

সেরেস্তায় মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত হইলেও তিনি নিজ প্রতিভা এবং নৈসর্গিক কল্পনাশক্তির নির্গমনের সরণি প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভাবন করিতেছিলেন। সেখানেও তবিলদারের নিকট প্রভূত ধনরাশি সঞ্চিত দেখিয়া পার্থিব ধনের অসারতা ও তবিলদারদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতা কেমন চমৎকার একটি গীতে প্রকটিত করিয়াছেন :—

"আমায় দেও মা তবিলদারী, আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।"

আবার যখন তিনি গাহিলেন :—

"পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ;
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর্, কেবল চরণধুলার অধিকারী।"

তখন তাঁহার পরমার্থ-ধনের লালসা যে কত বলবতী, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হয়। এই সর্ব্বগ্রাসী পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্বে তাঁহার স্বামী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। প্রসাদকে তিরস্কার করা দূরে থাক, তেমন সাধুজনকে কিরূপ পুরস্কার দিবেন, তিনি তাহারই কল্পনা করিলেন। যে জায়গিরের জন্য প্রসাদ লালায়িত ও শিবের প্রতি ঈর্ষান্বিত, সে জায়গির প্রদান করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না বটে, কিন্তু যাহাতে প্রসাদ স্বয়ং সেই জায়গির-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহার উপায়-স্বরূপ প্রসাদকে একটি স্বাধীনবৃত্তি প্রদান করিলেন। প্রসাদের সঙ্গীতে যেমন তাঁহার পরমার্থলালসার মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বামীর এই গুণগ্রাহিতার নিদর্শনে ততোধিক ঔদার্য্য প্রকাশিত হইল।

প্রসাদী কবিত্ব।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি চমৎকার কাব্য; বাঙ্গালা ভাষায় তাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাব্য শান্তি-রসের প্রস্রবণ এবং সে প্রস্রবণ কল্পনা-লতিকায় সুশোভিত। রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন, তাঁহার ভক্তিরসে। তাঁহার সঙ্গিতাবলী যে ভক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীর রাজসিক ভক্তি নহে,—যে রাজসিক ভক্তি কেবল বাহ্য জাঁকজমকে প্রকটিত হইতে চায়; কিন্তু তাহা প্রকৃত সাধকের সাত্ত্বিক ভক্তি। যে প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া রামপ্রসাদ সমুদায় ধনসম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়া বিরাগী হইয়া গিয়াছিলেন তাহা কি প্রকৃত সাত্ত্বিক অনুরাগ নহে? তাহা হৃদয়ের ভক্তি মুখের ভক্তি নহে। সেই সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজসিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে:—

"মন তোর এত ভাবনা কেন?
জয় কালী বলে বস্ না ধ্যানে।
জাঁকজমকে ক'রলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রব পূজা, জানবে নাক জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে?
আমি মনোময় প্রতিমা গড়ে, বসা'ব হৃদ্ পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি সে তোর আয়োজনে?
আমি ভক্তি-সুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হ'ব মনে মনে।

মেষ মহিষ ছাগ আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে ?
জয় কালী বলে দাওরে বলি, এ দেহের ষড়্‌রিপুগণে।
কাজ কি রে তোর বিল্বদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে ?
এ দেহে আছে সহস্র দল, দাওরে মায়ের শ্রীচরণে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোষণায়ে ?
এ দেহে আছে জ্ঞানদীপ, জ্ব'লতে থা'কবে নিশি দিনে।
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে ?
জয় কালী বলে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে॥

রামপ্রসাদের এই সাত্ত্বিকভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর াগে। তাহার শান্তরসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। আর্দ্র ইয়া যায় বলিয়া মন গানের সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়। াই, রামপ্রসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে ক্ষণিকের ন্যও প্রমত্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ে বৈরাগ্যো-য় হয়, একবার রামপ্রসাদের সঙ্গে চিত্ত ভগভক্তিতে পূর্ণ হয়, ায়ের শ্রীচরণে মন সমর্পিত হয়, সংসার অসার জ্ঞান হয়। কি কম কথা! রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গধামে তাই এত ধুর! সেই মধুরতার কারণ, রামপ্রসাদের সাত্ত্বিক ভক্তিরস। সেই ভক্তিরস রামপ্রসাদের অন্তরে যেরূপ প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সঙ্গীতে ঠিক সেইরূপ প্রগাঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সঙ্গীতাবলী রামপ্রসাদের অন্তর্দ্দেশকে মুকুরবৎ প্রতিবিম্বিত করে। দেখায়, সেই ভক্তি অতি প্রগাঢ় বলিয়াই াহা সঙ্গীতরূপে প্রকটিত হইয়াছে। যদি ভাবের প্রগাঢ়তা া থাকে, তবে সঙ্গীত কিছুই নহে। যাহা অতি ঘন, তাহা ঙ্গীতের ঘন ক্ষেত্রে দেখা দেয়। নহিলে সঙ্গীত কেন? ন্যরূপে ত বাহির হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার

যো নাই। ঘন সামগ্রী ঘন আকারেই বাহির হইতে গেলেই তাহা সঙ্গীতরূপে প্রকটিত হয়।

রামপ্রসাদের এই ভক্তি-প্রগাঢ়তা বেদান্ত ও আগমের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে তন্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। যাঁহারা সে গভীরতায় ডুবিতে পারেন, তাঁহারা সেই সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দ্বিগুণ মোহিত হয়েন। দেখেন, কত ভাব কত অল্প কথায় কেমন সুন্দর ভাবে প্রকটিত! সেই ভাবের সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-ভূষণে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত। রূপক-শোভা নহিলে কি তত দূর গভীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয়? রূপক-শোভা ধারণ করাতেই তাহাদের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপমার সৌন্দর্য্যে ভাব-কুসুমাবলি কান্তিধারণ করিয়াছে। সেই কান্তি-মধ্যে তাহাদের গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত। প্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুঝা যায় না; অর্দ্ধ প্রকাশিত, অর্দ্ধ লুক্কায়িত। কি সুন্দর শোভা! সঙ্গীতে এত সুন্দর শোভা কোথাও নাই! সেই সুন্দর শোভায় ভাবকুসুমাবলি প্রস্ফুটিত। ভক্তিরস-সৌরভে দিক আমোদিত। ধর্ম্মভাবে মন পুলকিত। শান্তরসে চিত্ত বিগলিত। একদা রামপ্রসাদের ভক্তি-রসে আমরা মিশিয়া যাই। মিশিয়া তাঁহার সঙ্গে ভক্তিগানে প্রমত্ত হই! হাতে করতালি দিয়া প্রসাদী গীত গাই। ক্ষণেক স্বর্গসুখ সম্ভোগ করি। যে গীতে চিত্ত এত বিগলিত হয়, সে গীতের শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবে। শক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। ভক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। মুক্তির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ। তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি!

শক্তি-সাধন-পথে।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন; সেই শক্তি শ্যামা, সেই শক্তি শ্যাম। শ্যাম ও শ্যামা একই শক্তি; একই শক্তি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্রী। এই শক্তির প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী লোকের হওয়া বড়ই কঠিন; মায়া-মোহ না কাটাইতে পারিলে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় না হইলে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ না জন্মিলে মায়া-মোহ কাটে না, এবং সম্পূর্ণ বিষয়-বৈরাগ্য না জন্মিলে ঈশ্বরানুরাগ সম্ভূত হয় না। মায়া-মোহ না কাটিলে ভগবদ্দর্শনলাভ হয় না, এবং ভগবদ্দর্শনলাভ না হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তি-সাধন-পথের অনেক স্তর আছে। যে আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারেন, সেই মুক্তির স্তরে আসিয়া তাঁহার ভগবৎ-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা। এই ভগবৎ-প্রত্যক্ষ পক্ষে ভক্ত যত নিকটবর্ত্তী হয়েন, তদনুসারে তাঁহার সালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যে লোকে জীব দেবত্বে উপনীত হয়েন, সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবলোকে আসেন, সেই লোকে তাঁহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত এক লোকে থাকার নাম সালোক্য। এই দেবত্ব-লাভের পর সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভাবে ভক্ত যত ভগবদ্দর্শনের সমীপবর্ত্তী হইয়া একেবারে ঈশ্বরের সম্যক্ ঐশর্য্য-মূর্ত্তি দেখিতে পান, ততই তাঁহার সামীপ্য-মুক্তি সম্ভাবিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, যেমন অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। সামীপ্য-

মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারূপ্য বা সাষ্টি মুক্তি হয়। এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার নামই সাষ্টি বা সারূপ্য মুক্তি। যোগসাধন-দ্বারা এইরূপ যোগৈশ্চর্য্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এসমস্ত মুক্তিলাভ করিয়া যোগী যে স্তরে আসিয়া দাঁড়ান, তৎপরে কেহ কেহ সেই ঐশ্বর্য্যলাভেই অভিভূত হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা তৎপরে সাযুজ্য বা ঈশ্বরে-লয়মুক্তির প্রয়াসী হন। সাযুজ্য-মুক্তিলাভেও জীবের গুণভাব থাকে। কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিত একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব যত দিন থাকে তত দিন জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় না। এই গুণভাবের একেবারে বিনাশসাধন না করিতে পারিলে নিস্ত্রৈগুণ্য হয় না; নিস্ত্রৈগুণ্য না হইলে ব্রহ্মপদ-লাভ হয় না। এই ব্রহ্মপদ-লাভের নামই মোক্ষ বা লয়-মুক্তি। নির্গুণত্ব হেতু জীবাত্মা নির্গুণব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে। সংসারগতি না ঘুচিলে জীব পরমানন্দ অমৃতধাম লাভ করিতে পারে না। ভক্তি ও শক্তিসাধন-পথে এতই আধ্যাত্মিক স্তর। এক এক আধ্যাত্মিক স্তর হইতে তদূর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিলে, নিম্ন স্তরের মুক্তি সাধন হয়।

লোকে অগ্রে সাযুজ্য-মুক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না। কারণ, সে ভাব অনেক দূরের কথা। সে মুক্তির প্রয়াসী হইতে হইলে জীবকে সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়া অনেক দূর আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইতে হয়। রামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি শুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী

ছুটিয়াছিলেন। ভগবদ্দর্শন জন্য তিনি একান্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। অভয়পদ লাভের জন্য তাঁহার একান্ত লালসা হইয়াছিল। ভক্তের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তিলাভ করিতে পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অভয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। এই একান্ত লালসা তাঁহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদূর্দ্ধ আধ্যাত্মিক স্তরের আস্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাঁহার জন্মে নাই। তথাপি রামপ্রসাদ যে, সে সকল মুক্তির কথা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি পর্য্যন্তও যে তাঁহার এ যাত্রার আশা ছিল, তাহা তিনি :—

"মা আমি তোমারে খাব।
তুমি খাও কি আমি খাই মা, এবার (এ যাত্রায়)
দুটার একটা করে যাব॥" ইত্যাদি।

এই গীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গীতে ব্রহ্মের সহিত বিলয় হইবার আশা বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর এক গীতেও তাঁহার এই লয়মুক্তি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে। যখন তিনি পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন ;—

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?"

তখন তিনি সেই পরলোক-তত্ত্বের মীমাংসায় জীবের সালোক্যাদি নানা গতি বর্ণন করিয়া, শেষে তাহার পরাগতির কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেরূপ "জলবিম্ব মিশায় জলে" সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিলে তখন তাহার পরলোকগতি শেষ হয়। নহিলে রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন যে, যিনি যাহা বলেন, সে সকলই সত্য ; কোন মুক্তিই

অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল মুক্তিলাভেও আত্মার পরলোক-গতি নিবারিত হয় না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোক এইরূপ চিরদিনই চলে। কিছুতেই তাহার সংসারগতি নিবারিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে, যতদিন সূক্ষ্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে। অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিষ্কাম হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে একেবারে মিশিয়া যান, তখন তাঁহার স্থূলদেহ পরিবর্জ্জন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে না। "যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে" তেমনি জীবের শেষ হয়। যে ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে আত্মার জীবত্ব ঘটিয়াছিল, সেই মহান্ ও অনন্ত ব্রহ্মসত্ত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাহার আর জীবত্ব থাকে না। তাঁহার বিশেষ ভাব শেষ হইলে তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীবত্ব। জীবত্ব যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে। পরলোকে যদি এই জীবত্বের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ ভাব ঘটে। বিশেষ ভাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু। অবিশেষ ভাবে উপনীত হইতে পারিলেই আত্মা অমৃতপদ লাভ করিতে পারেন। তখন সেই আত্মার মৃত্যুভয়-নাশন প্রকৃত অভয় পদ লব্ধ হয়। তখন তিনি অবিশেষ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান ?

"যেমন জলবিম্ব মিশায় জলে।"

রামপ্রসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে। ভগবদ্ভক্তির যতই প্রগাঢ়তা জন্মিয়াছে, ততই তিনি এক এক

ভাবে উপনীত হইয়া এক একটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তি-সাধনার প্রতি পদের চিহ্ন এই সঙ্গীত-মালা। সেই চিহ্ন অনুসারে তাঁহার সঙ্গীত-মালা গাঁথিতে পারিলে, ভক্তি-শাস্ত্রের এক রমণীয় রত্নমালা লাভ হয়। এই রত্নহারে তিনি শ্যামা-সুন্দরীকে শোভিতা করিয়াছিলেন। ভক্ত ভিন্ন কি অন্য কেহ এ হার গাঁথিতে পারে? ভক্তিরত্নমালায় মহাশক্তি ভগবতী সুশোভিতা।

গৃহস্থ-সন্ন্যাসী।

সংসারে ঈশ্বর ভুলিয়া আত্মপূজা, সন্ন্যাসে সংসার ভুলিয়া ঈশ্বরপূজা। যিনি এদুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন তিনিই মনু এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী। যিনি সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, যিনি উদাসীন হইয়াও সংসারী, তিনিই প্রকৃত ভক্তিপথের পথিক। রামপ্রসাদের জীবনে এই দৃষ্টান্ত। তাঁহার সঙ্গীত মধ্যেও এই ধর্ম্মের উপদেশ। তাঁহার গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব; কিন্তু বিষয়ীর ভাব মধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ সঞ্জাত হয়, তিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপ্রসাদ সেই ভাবে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি সমুদায় বিষয়-সামগ্রীকে ঈশ্বর ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। সমুদায় বিশ্ব তাঁহার নিকট কালী নাম লেখা। ভক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বৃন্দাবন কৃষ্ণময়, তাঁহার শ্রবণে বংশীধ্বনিও যেমন রাধাময়, তেমনি রামপ্রসাদের ভক্তিতে সর্ব্বসংসার তারাময়। সর্ব্বসংসার তাঁহাকে ভক্তিপথে আহ্বান করিতেছে। সর্ব্বসংসার তাঁহার নিকট ভক্তি

গীত গাহিতেছে। এই জন্য তাঁহার গীতাবলী কি বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তি-ভাবে পূর্ণ হয়েন, তখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহিয়া বসেন; আবার বিরাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জন্য রামপ্রসাদ সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন। ভিখারী তাঁহার বৈরাগ্যে পরি-তৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীতসুধা পান করেন; বৃদ্ধজনগণ ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া তদীয় সঙ্গীতামৃতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন; এ দিকে তরুণবয়স্কেরা তাঁহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হয়েন। এইজন্য যেমন রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত,—এমত আর কাহারও নহে। জয়দেব, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদাবলী কেবল বৈষ্ণবেরা কখন কখন সঙ্গীত করেন। নিধুবাবু, ধরণী ও দাশরথিকে তরুণবয়স্কেরা কখন কখন স্মরণ করেন। কিন্তু কাহার গৃহে না রামপ্রসাদের গীত সঙ্গীত হইতেছে? বসিয়া আছি হঠাৎ ভিখারীর মুখ হইতে প্রসাদী গীত বিনিঃসৃত হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিল। অমনি একদা আমাদিগের মন অন্যদিকে প্রত্যাবৃত্ত হইল, একদা তাঁহার কল্পনায় ও ভাবে গদ্‌গদ হইয়া গেলাম; অমনি সেই সুরে সুর দিয়া আমরাও মনে মনে গাহিয়া উঠিলাম। একবার রামপ্রসাদের ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিলাম।

প্রসাদী মৃত্যুঞ্জয়ী ভাব।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়ভাব—সুন্দর, সরল

অথচ সৎসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সরল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্বল প্রকাশিত হইতেছে—রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধুজীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, রামপ্রসাদের বাগ্‌ভঙ্গি অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগ্‌ভঙ্গি দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি, সাধন-বলে এবং সাধুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলদর্পিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীত গুলি এই প্রকার ধর্ম্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময় আমরাও যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয়জ্ঞান হয়, এবং দেব-ভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব-অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যামা-পূজা করি, শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়ভাব

আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় আসিয়া অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। তাহাতে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি; তাহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাহাতে স্ত্রীজাতির ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবলা, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাঁহার ধর্ম্মশক্তি আছে, সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাঁহার পদতলে। একবার এই ভাবে প্রমত্ত হই, রামপ্রসাদের মত আমরাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপূজা, না ভক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া? প্রসাদী গীতে আমরা এই রূপে ভক্তি ও ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হই।

প্রসাদী পাণ্ডিত্য।

রামপ্রসাদের রূপকময় কতকগুলি গীত দুর্ব্বোধ। প্রসাদের পাণ্ডিত্য তাহার প্রধান কারণ। এক্ষণকার সাধারণ লোকসমাজে শাস্ত্রবিদ্যার তত প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্ব্বে পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও দর্শনশাস্ত্রীয় মতামত সাধারণসমাজে একপ্রকার সুপ্রচারিত ছিল। সকলেই যে শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল এমত নহে, কিন্তু তখনকার কালে হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য বিদ্যার তত আলোচনা না থাকাতে শাস্ত্রীয় মতামত, বিশেষতঃ তান্ত্রিক শাস্ত্রের মতামত সর্ব্বদা লোকসমাজে আন্দোলিত হইত এবং

গ্রহার সাধারণ মর্ম্ম অনেকেরই পরিচিত ছিল। যাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিত, তাহাদিগেরও মধ্যে শাস্ত্রীয় মতামতের অভিজ্ঞতা ছিল। ফার্সী বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলেও তাহার মতামত সম্বন্ধে অল্পই আন্দোলন ছিল। কারণ, ফার্সী বিদ্যার লোক-প্রচলিত গ্রন্থ সকল অধিকাংশই উপন্যাসপূর্ণ। হিন্দুর সাধারণ সমাজে ফার্সীর কাব্য ও উপন্যাসই অধিক অধীত হইত। সুতরাং তাহার মতামত ও দার্শনিক তত্ত্ব সমুদায় লোকসমাজে তত আন্দোলিত ও পরিচিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রীয় মতামত ও দার্শনিক তত্ত্বনিচয় অগত্যা সাধারণজনগণের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কতদূর শাস্ত্রাদির আলোচনার সম্ভাবনা, তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। অতএব, রামপ্রসাদী পদাবলী এক্ষণে সাধারণের বোধগম্য না হইলেও তৎকালে তত দুর্ব্বোধ বলিয়া গণনীয় হইত না। শাস্ত্রবিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন আমাদিগের নিকট সেই পদাবলী অধিকতর দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণেই হউক, যখন সেই পদাবলী দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগের টীকা ও ব্যাখ্যা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সকল গীত তান্ত্রিক যোগ-জ্ঞান-মূলক, টীকা ও টিপ্পনী ভিন্ন সাধারণ লোকের নিকট তাহাদের অর্থবোধ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহজে যে গানের অর্থবোধ না হয়, সে গান সঙ্গীত হইলে কোন ফলোদয় হয় না।

প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

পণ্ডিতবর রামগতি-ন্যায়রত্ন তাঁহার "বাঙ্গালা-সাহিত্য"-বিষয়ক প্রস্তাবে রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরকে অধিকতর আদরণীয় জ্ঞান

করিয়াছেন। আমরা পণ্ডিতবরের মতের পোষকতা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান করি, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের নিকট তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কিছুই নহে। তাহা তাঁহার তরুণ বয়সের রুচি-প্রসূত। রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিই তাঁহার যশের নিদান। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে ততদিন প্রসাদী সঙ্গীতও প্রচলিত থাকিবে। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের আর কেহই তত্ত্ব করে না, কেহই তাহা অধ্যয়ন করে না। আমরা প্রসাদী সঙ্গীত অন্বেষণে যত ব্যস্ত, তাঁহার বিদ্যাসুন্দর দেখিবার জন্য তত ব্যগ্র নই। এই গানগুলিতে রামপ্রসাদের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ভক্তি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্য লিখিবার শক্তি যাঁহার উৎকৃষ্টতর ছিল, তিনি তাহা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আবার রামপ্রসাদ সহস্রবার চেষ্টা করিলেও ভারতচন্দ্রের মত কাব্য লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু ভারতচন্দ্র সহস্রবার চেষ্টা করিলেও একটী প্রসাদী পদ রচনা করিতে পারিতেন না। তাঁহার সে ভক্তি কই? তাঁহার অন্নদামঙ্গলে পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু ভক্তিরস নাই। তাহাতে ভক্তিগত লীলা-বর্ণনা ও রঙ্গরস আছে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তিরস নাই। ভারতচন্দ্রের ভক্তি বিষয়ীর ভক্তি মাত্র। সেই ভক্তিতে ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রতিভা-জনিত রঙ্গরস-প্রিয়তা মিশিয়াছিল। তাই, তাহা ভারতচন্দ্রের বিশেষ কবিত্ব-রসে দেখা দিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ এবং বৃদ্ধ হরের সহিত গৌরীর বিবাহকালে সেই কবিত্বের পরিচয় হয়। আমরা সেই কালে ভূতপ্রেতগণের নৃত্য ও সর্পগণের লীলা দেখি। নারদ কেমন এয়োগণ এবং মেনকাকে লইয়া কৌতুক করিতেছেন তাহা দেখি। বুড়া শিবের আবার

মোহন বেশ দেখি। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যেও ভারতচন্দ্র এক মুখে শ্যামাসুন্দরীর স্তুতি গান করিয়া সেই মুখে সেই স্তুতি-গানকে বর্দ্ধমান-সুন্দরীর প্রেমগানে পরিণত করিয়াছেন। ভক্তিরস-সাধনার ফল সেই প্রেমপাঠে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আজি যদি রামপ্রসাদী একটি নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত পাই, অমনি যেমন আনন্দে পুলকিত হই, ভারতচন্দ্রের একটি নূতন কবিতা পাইলে, তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হই। প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর খুলিলে তাঁহার গুণপনার মধ্যে অনেক স্থলে কেবল অনুপ্রাসেরই ধুমধাম দেখা যায়। প্রসাদের অনুপ্রাসপ্রিয়তা তাঁহার সঙ্গীত-মধ্যেও লক্ষিত হয়, কিন্তু এস্থলে আমরা ভাবে এত বিমোহিত হই, যে সে দিকে আমাদিগের আর দৃষ্টি যায় না। এস্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কার রূপেই প্রতীয়মান হয়।

অসাম্প্রদায়িকতা।

বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য বৈষ্ণব সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এই বৈষ্ণব-রস-প্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্য মধ্যে শক্তি-সাধনার ভক্তি-রসাশ্রিত প্রসাদী সঙ্গীত-নিচয় এক সুশোভিত দ্বীপরূপে প্রতীত হইতে থাকে, এখানে ভক্ত আসিয়া এক নূতন মধুর ধ্বনি শুনিতে পান। এ দ্বীপ কালী-নামের মা মা রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মা বলিয়া ডাকিলে সন্তানের মত ভক্তের মনে যে জোর পৌঁছে, সে জোর আর কিসে আইসে? রামপ্রসাদ সেই জোরে মাকে প্রাণ-ভরিয়া ডাকিতেন। এ দ্বীপে আসিয়া ভক্ত একবার রাম-প্রসাদের সঙ্গে উচ্চরবে মা মা বলিয়া প্রাণ খুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতে পারেন। যেন মনে হয়, তিনি এক নূতন রাজ্যে আসিয়া মা বলিয়া প্রাণ খুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতে পারিলেন।

ডাকিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। বৈষ্ণবী গীতিতে তিনি এরূপ জগন্মাতাকে ডাকিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। দেখিলেন, কালীবীজ হইতে এ দ্বীপ সহস্রবিধ তরুরাজিতে বিরাজিত। ভক্তিরস তাহাদিগকে পরিপোষণ করিতেছে। কোথাও সেই তরুরাজিতে বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল পুষ্পিত হইয়াছে, কোথাও তান্ত্রিক যোগবিদ্যার ফল ফলিয়াছে। বৈরাগ্য, শান্তি ও পুণ্যের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া কালীনামের সংকীর্ত্তনে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহা! কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় নিকেতন! এ স্থানে ভগবৎ-শক্তি সমভাবে হরিহরের আশ্রিতা হইয়া দেখা দিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক পূতিগন্ধ এ দেশকে কলুষিত করে নাই। শ্যাম, শ্যামা রূপিনী হইয়া রাধা-পার্শ্বে রহিয়াছেন। তাই শ্যামা নামের সঙ্গে রাধা-নাম সঙ্গীত হইতেছে। এ পবিত্র স্থানে প্রকৃত ভক্তের উদার হৃদয় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়। বেদান্তীর বৈরাগ্যে তাঁহার মন উদাস হয়। তাঁহার মৃত্যু-ভয় তিরোহিত হয়। একই ব্রহ্মশক্তিতে পরিপূত হইয়া তিনি শ্যাম, রাম ও হর-গানে দিক পরিপূর্ণ করেন। রামপ্রসাদের উদার আত্মার সঙ্গে নিজআত্মা মিশাইয়া দেন। রাধা-নামের সহিত শ্যামা-সঙ্গীতে পুলকিত হইয়া উঠেন। দেখেন, একই ব্রহ্ম সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান। দেখেন :—

"তিনি সবরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার।"

তখন তিনিএই মহান্ ভগবদ্বাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া উদাত্ত-স্বরে বলিয়া উঠেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥"

কাব্য—বঙ্গসমাজে।

বঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত আছে। বৈদিক কালে যখন চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তখনকার কালে তৎসঙ্গে সঙ্গে অতি পরিপাটীরূপে দ্বিজগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে শিক্ষিত হইতেন। শুদ্ধ গ্রন্থাবদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষিত নহে; আচারে-ব্যবহারে, কাজে-কর্ত্তব্যে, জ্ঞানে-অনুষ্ঠানে, হাতে-কলমে, সর্ব্ব বিধায়ে তরিবদ প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বকালে, পুঁথীর জ্ঞান ও গুরুর উপদেশ মাত্র শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত না। যাহাকে তরিবদ বলে, যাহাকে Discipline বলে, যাহাকে কাজে দক্ষতা বলে, তাহার নাম শিক্ষা। সুধু বই পড়িলে শিক্ষা হয় না, সুধু শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত হইলে শিক্ষা হয় না। লোকচরিত্র সংগঠন করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে অর্থে ঘোটক শিক্ষিত হয়, যে অর্থে অবলাগণ শিক্ষিত হন, সেই অর্থে তখন লোকে শিক্ষিত হইত। যিনি সদাচারী ও সচ্চরিত্র, তিনিই সুশিক্ষিত; আশ্রম-নিয়ম প্রতিপালনের জন্য শিক্ষিত হইত; কার্য্য ও অনুষ্ঠান সমুদয় সুচারুরূপে সমাধা হইবে বলিয়া শিক্ষিত হইত। শুদ্ধ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষালাভ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের ব্রতপালনে যে শিক্ষা হয়, গৃহস্থাশ্রমের সমস্ত কর্ত্তব্য-সাধনে যে শিক্ষা হয়, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রমের সমুদয় নিয়মানুষ্ঠানে যে শিক্ষা হয়, সেই ধর্ম্ম-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষানামের যোগ্য। সেইরূপ

ধর্ম্মশিক্ষায় দ্বিজগণকে সুশিক্ষিত করা প্রাচীন হিন্দুসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য অনুসারে সমাজের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী সমাজও চলিত।*

এখন ভারতে চারি আশ্রমের নিয়ম আর বিদ্যমান নাই; কিন্তু তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়া আছে। সে রোম গিয়াছে, রোমের ভগ্নাবশেষ আছে। এই ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা রোমের উদাত্ত কল্পনায় উত্থিত হই। হৃদয়ে সেই রোমের শত ঐশ্বর্য্য চিত্রিত করি। ভাবি—সেই ঐশ্বর্য্যপুরীর ভগ্ন-মন্দির, বঙ্গের চতুষ্পাঠী। অরণ্যের পবিত্র আশ্রমে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যেখানে মুনিঋষি বসিয়াছিলেন, যে আশ্রমে শত শত ছাত্র ঋষি-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া শিক্ষামৃত পান করিত, যাঁহার আশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইলে রাজরাজেন্দ্রকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যাইতে হইত, আজি বঙ্গের চতুষ্পাঠীর কুটীরে তদ্রূপ গুরু আলয়ে ছাত্রবেষ্টিত অধ্যাপক মহাশয় সমাজের আলোকস্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তর্কালঙ্কারের গাত্রে শাস্ত্রীয় বিদ্যা-জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মহাশয় অতি সুচারুরূপে শাস্ত্রীয় মীমাংসা করিয়া নানা দিগ্‌দেশে বিধান দিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় সংসার চলিতেছে। তাঁহার শাসনে ধর্ম্মের গতিবিধান হইতেছে। তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছে; নানা দিগ্‌দেশ হইতে ধনরাশি আসিয়া তাঁহার পুণ্যভাণ্ডার পরি-

* আধুনিক ইংরাজীওয়ালাদের মতের সহিত এ শিক্ষার কত প্রভেদ! তাহাদের মতে গোচ্চার বই পড়িলেই শিক্ষা হয়। তাই বালক বালিকাগণকে গোচ্চার বই পড়াইয়া মনে করেন, তাহারা বিদ্যালাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে মহিলাগণ বই না পড়িয়াও সুশিক্ষিতা হইত। এবিষয় "সাহিত্য-চিন্তায়" বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ণ করিতেছে। এ চিত্র যদি আজিও দেখিতে চাও, সেই প্রাচীন কালের আশ্রম-ছায়া যদি আজিও প্রতীতি করিতে চাও, তবে যাও, একবার ভট্ট-পল্লীর ও নদীয়ার পবিত্র চতুষ্পাঠী সমুদয় অবলোকন করিয়া আইস। আসিয়া বল, হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা-মন্দির সমুদয় কেমন পবিত্র স্থান। তাহা ইংরাজী বড় বড় সুখ-হর্ম্ম্য-অভ্যন্তরস্থ বিদ্যালয় অপেক্ষা কি সুন্দরতর নহে? সেই পবিত্র কুটীর কি পুণ্য-জ্যোতিতে আলোকিত নহে? তাহাতে যে আচার্য্য মহাশয় বসিয়া আছেন, তিনি কি ইংরাজী বিদ্যালয়ের অহঙ্কৃত, পাপ-মলিন শিক্ষক অপেক্ষা অধিকতর সংযমী, বিনীত এবং সাধুচরিত্র নহেন? তাঁহাতে যে বিদ্যার ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে কি এক দেবভাব অনুভূত হয় না? যদি না হয়, তবে তুমি হিন্দু নও। মলিনতা তোমার চারিপার্শ্বে, দৃষ্টিতে তোমার পাপ-ছবি, আর হৃদয়ে তোমার কলঙ্ক!

আবার এই পুণ্যধামের বাহিরে সংসারাশ্রমে কিসের ছায়াপাত? বৈদিক কালে যে সূর্য্য সংসার-আশ্রম আলোকিত করিয়াছিলেন, আজি কি সে সূর্য্য একেবারে অস্তমিত? আমরা ত দেখি না। সে সূর্য্য নিষ্প্রভ নহে, তাহার হেমপ্রভা আজিও বঙ্গীয় সংসারধামকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। প্রাচীন কালে ধর্ম্মের যে লীলাময় কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, আজিও সংসারাশ্রম তদ্রূপ ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া আছে। ধর্ম্ম তাহার সুদৃঢ় বন্ধন, স্বয়ং ঈশ্বর সেই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ত্তা। মানবকুল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরের অদৃষ্ট-রজ্জুতে আবদ্ধ। সেই রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পুত্তলীর ন্যায় লীলা করিয়া যাইতেছে। ভগবানের হাতে সংসারের ঘোর সুদর্শন-চক্র। যে চক্রের গতি কাহারও চক্ষে দৃশ্য নহে, ভগবানের

নিকট তাহা সুদর্শন। যাহা ভগবানের সুদর্শন, জীবের তাহা অদৃষ্ট। যে সুদর্শন-চক্রে সংসারের সমস্ত বল—রাজবল, লোকবল, বীরত্ববল, দর্পবল, ঐশ্বর্য্যবল, বিদ্যাবল, কৌশলবল, কর্ম্মবল, শারীরবল, বিক্রমবল, সমস্ত বলই পরাভূত—সেই সমস্ত জীববলের বিধ্বংসকারী দৈববলের চক্র সংসারপতি ত্রৈলোক্যনাথের হাতে। চিরদিন তাঁহার হাতে সেই চক্র রহিয়াছে। অযুতবলে তাহা চিরদিন ভ্রাম্যমাণ। ভ্রাম্যমাণ তাঁহার লীলাময় কর্ম্মক্ষেত্র-ব্রহ্মাণ্ডে—ত্রিসংসারে—পৃথ্বীতে—ভারতে—বঙ্গে। তবে কেন বল, এ সংসার প্রাচীন কালের দেবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ নহে? আজিও বঙ্গসমাজের কর্ত্তা সেই বিধাতা, আজিও সংসারের ধর্ম্মনেতা সেই পরম পবিত্র "সত্যং, শিবং, সুন্দরং।" সমাজের শিক্ষাদাতা সেই পরাৎপর পরম গুরু মহাজ্ঞানী—মহেশ্বর।

দেখিতে চাও, এ বঙ্গের সংসারধাম ধর্ম্মের পরম শিক্ষাস্থান কি নয়? সংসার কোন্ স্রোতে নীয়মান? বঙ্গীয় সমাজ, কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষাদাতা। এ বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষা নয়, এ বিস্তারিত কার্য্যক্ষেত্রের ধর্ম্মশিক্ষা। যে কার্য্যক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই নামিয়া সারি সারি, পার্শাপার্শি, হস্তপদে, অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, বঙ্গীয় জনসমাজ সেই কার্য্যক্ষেত্রের মহান শিক্ষামন্দির। এই মন্দির গড়িয়া গিয়াছেন—বৈদিক ঋষিগণ হইতে ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ।

হিন্দুর মোক্ষপদে যাইবার তিনটি মহা সোপান—ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এমন লোক সকল জন্মিয়া গিয়াছেন,

যাঁহারা এই ত্রিপথ মাত্র অবলম্বন করিয়া মুক্তির মুখ দেখিয়াছিলেন। সেই শুকদেব, সনক, সনাতন, নারদাদি মহাজনগণকে আশ্চর্য্য হইয়া আজিও আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখি। আমরা সংসারের ধূলিতে ধূসরিত হইতেছি, তাঁহারা এ ধূলিতে পদার্পণও করেন নাই। সমুদয় প্রবৃত্তিবল—আসুরী পাশববল—প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়াসক্তির ভীমবল—তাঁহারা মহা সংযমবলে অনায়াসে পরাভূত করিয়া গৃহস্থাশ্রমের মায়াময় দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ সংসারধাম অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া এই সংসার-মধ্যেই যে এক শান্তিময় পুণ্যধাম আছে, সেই ধামে পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের চরিত্রশিক্ষা আমাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তত দূর বল বুঝি আমাদের নাই। তাঁহারা এক এক জন বহুকাল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মচর্য্যেই সমস্ত দেববল আহৃত করিয়াছিলেন। সেরূপ কঠিন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত এক্ষণে কোথায়? প্রতিধ্বনি বলিতেছে—কোথায়? সেই ব্রহ্মচর্য্য—যাহাতে সমগ্র,—বেদমন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, দর্শন প্রভৃতি সমুদয় জ্ঞানময় শাস্ত্র পর্য্যালোচিত হইত; সেই ব্রহ্মচর্য্য—যাহাতে গুরু-চরিত্রে শিষ্যগণ সংযমীর সমস্ত সংযমবল অবাক্ হইয়া অবলোকন করিতেন, আর ভাবিতেন, এইরূপ সংযম না অভ্যাস করিতে পারিলে বুঝি কিছুতেই শান্তি নাই; সেই ব্রহ্মচর্য্য—যে ব্রহ্মচর্য্যে শিষ্যেরা যৌবনের ভয়ঙ্কর কাল সংযমপথে বিচরণ করিয়া তবে সংসারে অবতরণ করিতেন—সংসারে অবতরণ করিতেন, কেবল সংযম শিক্ষা দিবার জন্য—আজি সেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করা বড়ই কঠিন। কঠিন আজি কেন? তখনকার দিনেও

কঠিন ছিল। কয়জন শুকদেব, সনৎকুমার, নারদ ও ভীষ্ম তখন জন্মিয়াছিলেন? সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া প্রাচীন কালে প্রায় সকলকেই যাইতে হইয়াছিল; আজিও যাইতে হইতেছে। তথাপি চির-কুমারগণের চরিত্রে সংযম ও নিবৃত্তি-শিক্ষা আমরা আজিও লাভ করিতেছি। তাঁহারা আমাদের চক্ষে, মানবের কতদূর ধর্ম্মবল সম্ভব, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ধর্ম্মবলের আদর্শ-স্বরূপ তাঁহারা আমাদের কল্পনায় আজিও সমাজের শাসন-গুরু রূপে জীবিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্মপথ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার ছিল। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—ব্রাহ্মণের কর্ম্ম-ক্ষেত্র, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মক্ষেত্র, বৈশ্যের কর্ম্মক্ষেত্র, শূদ্র এবং সমুদয় শঙ্কর জাতিরও কর্ম্মক্ষেত্র। এ কর্ম্মক্ষেত্র ব্রহ্মচর্য্যের ঋষির আশ্রম নহে, বানপ্রস্থাবলম্বীর আরণ্যাশ্রম নহে, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যাশ্রম নহে। এ কর্ম্মক্ষেত্র মায়াময় সংসার। প্রধান মায়া—তোমার কলত্র; দ্বিতীয় মায়া—তোমার সন্তান সন্ততিগণ। ব্রহ্মচারী সংসারে আসিয়া ঘোর মায়ায় আবদ্ধ। একদিকে স্নেহ তাঁহাকে পুত্র-কলত্রদিকে টানিতেছে, অন্য দিকে ভক্তি তাঁহাকে পিতা মাতার দিকে টানিতেছে। একদিকে যৌবনোদ্দৃপ্ত সমস্ত ভোগ-লালসা তাঁহাকে পাপপথে লইয়া যাইতে চাহে—অন্যদিকে সদ্‌বুদ্ধি ও শান্তিলালসা তাঁহাকে পুণ্যপথে আনিতে চাহে। সংসারের এই মহাসন্ধিস্থলে সবাই অবস্থিত। এই কর্ম্মক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই লিপ্ত। এই ঘোর যুদ্ধে কে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে?

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জন্য ব্যাস, বেদ, দর্শন, উপনিষৎ কল্পই রাখিলেন; কিন্তু সংসারীর জন্য কোন্ বিদ্যা আবশ্যক, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ব্যাস এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। সে শাস্ত্র ভক্তিবিদ্যা। সেই ভক্তিবিদ্যায় কুরুক্ষেত্রের জয় ঘোষিত হইল। দশ-ইন্দ্রিয়-প্রমুখ পাপ-রাবণের উপর মহাভক্তগণের জয় সঙ্গীত হইল। তাহার সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান ভগবদ্গীতায় নিহিত হইল।

যৌবনের লালসা ও আসক্তি সকল এমনই প্রবলা যে, তাহারা প্রমত্ত বারণ বা অসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত। তাহাদের বলবীর্য্য পাশব বলেরও সমধিক। তাহাদের বৃদ্ধি রক্তবীজের ন্যায় অনিবার্য্য। সে বৃদ্ধি ও সে বল কিসে প্রশমিত হয়? হৃদয়ের সমস্ত পারমার্থিক শক্তি ভক্তিমতী হইলে যে দেববলের উপচয় সম্ভবে, সেই দেববল নহিলে পাশববলের সংযম সাধ্য নহে। সেই দেববলের শক্তি—যে দেববল রিপুকুলের উপর জয়লাভ করিবে—সেই দেববলের শক্তি সমস্ত পুরাণে অসংখ্য দেব-দেবীর সৃষ্টিকাণ্ডে প্রদর্শিত হইল। বিষ্ণু নিজেই কর্ম্মী হইয়া সমুদয় রিপুকুলের ধ্বংস সাধন করিলেন। পুরাণে যে কালভয়ঙ্করী শক্তি, তমোবিনাশিনী কালী—দ্বারকায় ও মথুরায় সেই তমোবিনাশন নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। যে বৈষ্ণবী শক্তি শ্যামা, সেই শক্তিই শ্যাম*।

* শাক্ত ও বৈষ্ণবী শক্তির উপাসকে সামান্য প্রভেদ। প্রভেদ না থাকাই উচিত। গোপাঙ্গনাগণ কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। রূপভেদে ভগবান একই, এজন্য সকল ভগবদ্ভক্তই ঈশ্বরোপাসক। গীতা সেই কথাই বলিয়াছেন। যিনি যে ভাবে ডাকেন, সবাই সেই ভগবানকেই ডাকেন। সকল রূপই ভগবানের ঐশ্বর্য-মূর্ত্তি। সর্ব্ববিধ ভক্তিনদী এক মহা ঐশীভক্তি-সাগরে মিলিত হয়।

রিপুকুলের সহিত যুদ্ধ ও জয় লাভ করিবার জন্য এ সংসার পারমার্থ-শক্তি যে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহারই অনুরূপ চিত্র—কাল রূপ। সেই কালরূপে দেবশক্তি চতুর্হস্তশালিনী, অসি ও নৃমুণ্ডধারিণী, অভয় ও বরদায়িনী কালী—সেই ঘোর ভয়ঙ্কর রূপে তিনি শত্রুনিসূদন মধুসূদন শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ। যিনি মায়া-মোহজ মত্ততার নিসূদন, তিনিই মধুসূদন। মায়া-মোহজ মত্ততাই মধু-দৈত্য, সেই মধু-দৈত্য-বিনাশনরূপে শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন।

কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণের আবার মনোহর বনমালাধারী শ্যামরূপ আছে। সেরূপে তিনি শ্যামসুন্দর সাজিয়া ভক্তগণকে শান্তি বংশীধ্বনিতে অতি মধুররবে আহ্বান করিতেছেন। আহ্বান করিতেছেন কোথায়?—বৃন্দাবনধামে। যখন তোমার মন বৈরাগ্যে উপনীত হইবে, যখন সংসার হইতে তোমার চিত্ত পরিব্রাজক হইয়া ব্রজভাবে ব্রজপুরে আসিবে, যখন তুমি শুদ্ধ দেবভক্তিতে জীবন উৎসর্গ করিবে, যখন সকল কার্য্য ও সকল অনুষ্ঠান দেবতায় উৎসর্গ করিবে, যখন তোমার মন ভক্তিরসে কেবল দেব সম্ভোগে সুখী হইবে, তখন তুমি সেই বৃন্দাবনধামের শান্তির মধুর বেণুনিক্কণের স্বরে শুনিতে পাইবে, তখন দেখিতে পাইবে—এই সংসাররূপ কদম্বতলে যমভগিনী যমুনারূপা মহাকালের স্রোতস্বিনী-তীরে শ্যামসুন্দর বিরাজিত। তখ

বিভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন সাধকের জন্য ভগবানের নানাবিধ রূপ-কল্পনা নহিলে তিনি নিজে অরূপ। তাঁহার সূক্ষ্ম শক্তি সকলকে সূক্ষ্মরূপে প্রকট করিয়া সাধক তাঁহাকে ধ্যান করেন। চিত্তস্থির করিবার জন্যই তাহার রূপ কল্পনা। এ সকল বিষয় "দেবসুন্দরীতে" আলোচিত হইয়াছে।

দেখিতে পাইবে—প্রকৃতিশক্তি, শান্তি ও প্রেমরূপা উমা—পবিত্র ভস্মাবৃতগাত্র, পরম যোগীর শিবনেত্রসম্পন্ন সংসারের বিষময় সর্পজয়ী পরম ভোলানাথ মহেশ্বরের অঙ্কে পরিস্থাপিত—অথবা উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতিদেবী অন্নদার নিকট অন্ন লইয়া জগৎ পরিতুষ্ট করিতেছেন! অনন্তনাগ-বেষ্টিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শয্যায় সর্ব্ব-ব্যাপী বিষ্ণু শায়িত—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যসম্পন্না প্রকৃতিস্বরূপা লক্ষ্মী তাঁহার পদ-সেবায় নিরতা। প্রকৃতি পুরুষাশ্রিতা হইয়াই সংসারলীলা করিতেছেন। ভগবতী শিবশঙ্করকে মস্তকে ধরিয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশের সঙ্গে মিলিতা হইয়া দেখাইতেছেন—তিনি সেইরূপে সমস্ত দেবশক্তির সহায়ে পাপ-মহিষাসুর বধ করিয়া বিজয়িনী। সুরথ-রাজের ধ্যানজ দেব-গণের প্রতিমা—শঙ্খ-চক্র-তীর-ধনু-ধারিণী জগদ্ধাত্রী—সিংহবল পশু-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা। রিপুগণকে ছাগের ন্যায় শত শতবার বলিদান না দিলে জগদ্ধাত্রীর পূজা হয় না। রাসে মানস-বৃন্দাবন কুসুমিত, সমুদয় হৃদয়বৃত্তিরূপা গোপিকাগণ কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা। দোলে দেবানুরাগে সমস্তই আরক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত কুরু-ক্ষেত্রজয়ী যুধিষ্ঠির হিমালয়ে জীবন্মুক্ত, রাবণবিজয়ী বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র সরযূতীরে সশরীরে বিশ্ব-সংসারে লীন। সীতাদেবী শুদ্ধ জগৎস্বামীর পানে এক নেত্রে তাকাইয়া ভক্তিরূপিণী সশরীরে অদৃশ্য ও মুক্ত।

এই সমস্ত দেবাদর্শের পথ সৃষ্টি করিয়া ব্যাস পুরাণাদিতে তাহাদের প্রখ্যাপন করিয়াছেন। সেই দেবতাদের ধ্যান, ধারণা, ভাবনা ও সাধনার পথ পূজাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথই ব্যাসের অনুমত ভক্তিপথ। নারদ বলিতেছেন ঃ—

"পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ।"

নারদীয় ভক্তি-সূত্র।

বেদব্যাসের মতে ভগবৎ-পূজাদিতে অনুরাগই ভক্তিপথ। এই সাধনপথ অবলম্বন করিলে লোকসমাজ দেবাদর্শের ভাবনায় ক্রমে দেবোপম হইতে পারিবে। কিন্তু এই সাধনার পথ অত্যন্ত প্রশস্ত—এ সাধনা বহু অঙ্গসম্পন্ন। এই সাধনার বিস্তৃত পথে শুদ্ধ প্রতি হিন্দুর নয়—সমগ্র সমাজের ধর্ম্মশিক্ষা হয়—শিক্ষা অনুষ্ঠানে, কার্য্যে এবং প্রবৃত্তিতে। সমস্ত সমাজ-ব্যাপিয়া সেই পূজাপদ্ধতি এইজন্য বিস্তৃত রহিয়াছে। এক এক তিথিতে, এক এক মাসে, এক এক বারে, এক এক যোগে—পূজা, পার্ব্বণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বার ও ব্রত। লোক-সমাজকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য এক এক বিশেষ বার-তিথির পুণ্য অধিকতর কীর্ত্তিত হইয়াছে। নহিলে পূজাদির ফল সকল সময়েই সমান। রোগে, শোকে, ঐশ্বর্য্যে, শ্রমে, আলস্যে, দুঃখে, সুখে, প্রতিকার্য্যের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্ব সময়ে হিন্দু ও হিন্দুসমাজের সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মের শিক্ষা। ইচ্ছা না করিলেও হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছে—আশৈশব হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছে। হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দেয় তাহার সমাজ এবং তাহার গৃহধাম। হিন্দুর গৃহধাম দেবাধিকারে পরিপূর্ণ। তাহার চারিদিকে দেবতা। সেই দেবমণ্ডলী-মাঝে হিন্দু আশৈশব পরিবর্দ্ধিত। হিন্দুর পরিবারমণ্ডলে কেবলই দেবার্চ্চনার অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দু আশৈশব অভ্যস্ত। ব্যাস, হিন্দু-পরিবারমণ্ডলকে এইরূপে গড়িয়া দিয়াছেন। শুধু পরিবারমণ্ডল নয়, হিন্দুসমাজও সেই পূজার ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বারব্রত

এক গৃহে নহে, সমাজের অনেক গৃহে। পূজা এক বাড়ীতে হইলে, গ্রামশুদ্ধ লোক সেই পূজায় মত্ত। যোগে এক ব্যক্তি পুণ্যপরায়ণ নয়, সমস্ত সমাজ পুণ্যপরায়ণ ও পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী। শ্রাদ্ধে, তর্পণে, যাগে, যজ্ঞে, সমস্ত সমাজ অনুলিপ্ত। হিন্দু যে স্থানে থাকে, তাহার চারি পার্শ্ব হইতে পূজা এবং আনুষ্ঠানিক ভক্তিক্রিয়াকলাপের বায়ু অনবরত বহিতেছে। সেই বায়ু হিন্দুর নিশ্বাস-প্রশ্বাস—হিন্দুর প্রাণ। সুতরাং হিন্দুর গৃহে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দুকে হিন্দু হইয়া যাইতেই হইবে। হিন্দু-বঙ্গসমাজের এইরূপ কৌশল, ব্যাস-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিরাজ্য। বঙ্গীয় সমাজ ব্যাসের সৃষ্টি-কৌশলের পরিচায়ক। সংসারধামে পূজাদির প্রচার করিয়া ব্যাস এক অমোঘ ধর্ম্মশিক্ষার পথ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজই ধর্ম্মশিক্ষার প্রশস্ত মন্দির।

সংসারে ধর্ম্মশিক্ষা।

সংসারে ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সংসার ব্রহ্মচর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতে তাঁহার কেবল ভক্তিরই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল,—ভক্তি পিতামাতার প্রতি—ভক্তি গুরুর প্রতি—ভক্তি ঈশ্বরে। সংসারে যখন যৌবনের বিষমকালে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার আন্তরিক সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্তলালসা এবং সমস্ত রিপু অতি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে। মায়াময়ী জায়া, মায়াময় স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যাগণ তাঁহার হৃদয়াধিকার করিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মচর্য্যের ব্রাহ্মণ নাই। সংসার বড় বিষম স্থল। যে ঈশ্বর-ভক্তির বীজ ব্রহ্মচর্য্যে উপ্ত হইয়াছিল, সেই অঙ্কুরোৎপন্ন বৃক্ষকে ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ না করিতে পারিলে, এখানে

নিস্তার নাই। সাধনা-বারিতে তাহা পরিপুষ্ট করিতে হইবে
সে সাধনার পথ ব্যাস দেখাইয়া দিয়াছেন, সংসারের প্রতিমা
পূজাপদ্ধতি, সেই সাধনার প্রথম সোপান। মায়াময় সংসারে
থাকিয়া, জায়া-পুত্রকে স্নেহ করিয়া, জনক-জননী প্রভৃতি গুরু
জনের প্রতি ভক্তিকে প্রবল রাখিতে পারিলে, তবে ভক্তি দেবতে
আসিবে। দেবভক্তিকে শিরে ধরিয়া—যেমন নর্ত্তক শিরে কলস
রাখিয়া নর্ত্তনের সমস্ত কৌশল দেখায়—তেমনই করিয়া সংসারের
সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, অথচ দেবভক্তির স্ফূর্ত্তি ও
পরিণতি করিতে হইবে। দেবভক্তি আপনি হৃদয়ে ধারণ করিলে
হইবে না; পুত্রপরিবারগণকে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে। শুধু
পুত্র পরিবারগণকে নয়, সমস্ত সংসারকে—শিষ্যকে, যজমানকে
প্রতিবাসীকে, কুটুম্বকে, আত্মীয়-স্বজনকে, গ্রামবাসীকে তাহা
শিখাইতে হইবে। এসকলকে লইয়া হিন্দুর সংসার। এ
সকলকে ভাল না করিতে পারিলে, আপনার কুশল নাই।
সেই সর্ব্বজন-সাধনোপায় ভক্তিপথ, কেবল পূজা-পদ্ধতির
বিরাট ব্যাপার। তদ্দ্বারা স্ত্রীপুত্রগণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, জ্ঞানী ও
অজ্ঞানী, ঘোর বিষয়ী, কৃষক, ভদ্রাভদ্র, যুবকযুবতী, ক্ষত্রিয়
বৈশ্য, শূদ্র, বীর, ব্যবসায়ী, অতিথি, দাস, দাসী, সকলকে এক
নিগড়ে বদ্ধ করিতে হইবে। এক নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাদিগকে
শান্তিপথে আনিতে হইবে। নহিলে সংসারের মঙ্গল নাই। সমস্ত
সমাজ লইয়া আপনি। আপনি সমাজের অংশ মাত্র। সমাজই
বিশ্ব-জগৎ। জগতেই ঈশ্বরোপসনা। সমাজ ঈশ্বরনিয়মিত। সেই
সমাজকে নিয়মিত করা সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্য। সেই সমাজকে
সৎপথে পরিচালন করা ব্রাহ্মণের কার্য্য। কারণ, ব্রাহ্মণ বেদের

অধিকারী, জ্ঞানের অধিকারী। সূক্ষ্ম জ্ঞান, সাধারণ মনুষ্যসমাজে স্থূলরূপেই গ্রহণীয়। স্থূলরূপে তাহা ভক্তির সাধক হওয়া চাই। ভক্তিপথ প্রসারিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণের কার্য্য নানাবিধ হইল।

ভক্তির সাধনপথে ব্রাহ্মণের কার্য্য প্রধানতঃ—যজন, যাজন ও অধ্যাপনায় বিভক্ত। ব্রাহ্মণ শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর কার্য্য বড় গুরুতর। শিষ্যগণের অধিকার বুঝিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে। সেই অধিকার অনুসারে সমাজকে চালাইতে হইবে। জ্ঞানিগণ এজন্য দীক্ষাকার্য্য গ্রহণ করিলেন। শিক্ষাগুরুর কার্য্য কিছু বিস্তারিত। তাঁহাকে অনেক রকমে শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাহার প্রধান কার্য্য। সেই জ্ঞান, শাস্ত্রাধ্যাপনে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রচারিত করা চাই। জ্ঞানিগণ শাস্ত্র-অধ্যাপনায় রত রহিলেন। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য পৌরোহিত্য। তাঁহারা সমাজ ও গৃহ-পুররক্ষক। পুরোহিত, সংসারে যে জাল বিস্তার করিবেন, গুরুর হাতে তাহার রজ্জু। গুরু যে মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন, পুরোহিত সেই মন্ত্রের সমস্ত সাধনপথ প্রদর্শন করিয়া যাইবেন। সেই সাধনপথে যজমানগণকে পরিচালন করিয়া তাহাদিগের পারমার্থিক মঙ্গলবিধান করিবেন। গুরু-পুরোহিত একত্র সকল পারমার্থিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন—থাকিয়া দেখিবেন, শিষ্য যজমানের কতদূর উন্নতিসাধন হইতেছে। সেই উন্নতি অনুসারে গুরু দীক্ষা নিয়মিত করিবেন। পুরোহিত সেই দীক্ষানুসারে যজমানকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন। ঘোর বিষয়ীকে ক্রমে ক্রমে ভক্তি-

পথে উন্নত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাগণের ভক্তিপথ ঈষৎ খুলিয়া দেওয়া চাই। গুরু পুরোহিত কৌলিক না হইলে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। এজন্য হিন্দুসমাজে কুলগুরুর আবশ্যকতা। শুদ্ধ গুরুর আবশ্যকতা নহে, সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতকেও চাই। পুরোহিত সমস্ত অনুষ্ঠানের নেতা ও বিধাতা। পুরোহিতকে সর্ব্বদা আবশ্যক। তাঁহার কার্য্য প্রতি দিন, প্রতি মাসে, প্রতি পুণ্য তিথিতে, প্রতি ঋতুতে, প্রতি বৎসরে—সদা ও সর্ব্বক্ষণ। পুরোহিত নহিলে সংসার চলে না। বনে যাইবার সময়ও পাণ্ডবগণের পুরোহিতের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

সংসারে পুরোহিত।

সংসার-আশ্রমে ধর্ম্মপথের প্রধান শিক্ষক পুরোহিত ঠাকুর। গৃহীর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তাহাকে গড়িয়া আনেন—ক্রমে ক্রমে গড়িয়া আনেন। যে ঘোর বিষয়ী, আমোদ-প্রমোদের সহিত সামিষ নৈবেদ্যাদি ও বলিদান দ্বারা রাজসী পূজা চায়, তাহাকে সেই পূজায় নিরত রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রবৃত্তি-পথ পরিমার্জ্জিত করিয়া আনাই তাঁহার কার্য্য। সেই রাজসী পূজায়ও বিষয়ী, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকলই দেবতাকে উৎসর্গ করিতে শিখেন। শিখেন—দেবতাকে নিস্পৃহ হইয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। যাহা যাহা উৎসর্গ করিবে, তাহা দেবাধিকার, তাহা দেবতার দ্রব্য। দেবতাকে দান করিলে তাহা আর গ্রহণ করিবার যো নাই। দেবতাকে দিয়া, তাহা গ্রহণ করিলে দত্তাপহরণের ঘোর পাপ। লোভী হইয়া

আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কোন দ্রব্য দেবতাকে দিতে নাই। পুনঃ গ্রহণের জন্য দেবোৎসর্গ নিষিদ্ধ। হিন্দুর উৎসর্গ এই—এ বড় শক্ত কথা। এই উৎসর্গ ব্যাপারে যজমান বলির দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে শিখেন। তিনি প্রথমে প্রথমে হয় ত বলি ও উৎসর্গ দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন এবং দেবপ্রসাদী বলিয়া তাহা গ্রহণও করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে আকাঙ্ক্ষাও পরিবর্জ্জন করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন *। যাহা দেবপ্রসাদ তাহা একলা খাইতে নাই, তাহা সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। তাহার প্রতি লালসা রাখিতে নাই। এই উৎসর্গানুষ্ঠানে তাঁহার প্রথম শিক্ষা—তাঁহার প্রধান শিক্ষা। যে পুরোহিত এ শিক্ষা দিতে না জানেন, তিনি পুরোহিতের কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি দেবতাকে দিব, দেবতা তাহা গ্রহণ করিবেন, এ বড় পরিতোষের বিষয়। বিষয়ী সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আরও পূজানুষ্ঠানে অগ্রসর হন। যাঁহার দ্রব্য লইয়া সমস্ত সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহার উদ্দেশে কিছু উৎসর্গ না করিলে ভক্তিবৃত্তি পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়ীর ভক্তি সতত তাহাকে সেই পথে আনিতে চায়। বিষয়ী সেই জন্য পুরোহিতকে সর্ব্বদা নিকটে চান। তাঁহার ভক্তি পুরোহিতকে সর্ব্বদা ডাকিয়া আনে। স্ত্রীজাতির ভক্তি কিছু অধিকতর প্রবলা। সেই জন্য হিন্দুসংসারে বার-ব্রতের অনুষ্ঠান নিয়তই চলিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর, সংসারকে ক্রমে দেব-

---

* এই পূজাপদ্ধতিই রাজসী পূজা। মন্ত্রাদি-ব্যতিরেকে কিরাতাদি-কর্ত্তৃক যে পূজা, তাহাই তামসী পূজা। এই তামসী পূজার ফলে বাল্মীকি ক্রমে পরম ভক্ত হইয়াছিলেন।

সংসার করিয়া ভুলিতে চান। কোন্ কোন্ তিথি নক্ষত্রের ফল পুণ্যপ্রদ, তাহা পরিবারমণ্ডলে উপদেশ দেন। সেই পুণ্যতিথি নক্ষত্রে ভক্তির পূজার আয়োজন হইবে। আয়োজন হইলে তাহাতে গৃহের সকলেই মত্ত হইবে—গৃহিণী, গৃহস্বামী, বালক বালিকারা, দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত মাতিয়া যাইবে। যিনি উৎসর্গ ও দান করিবেন, তাহার ত ফল আছেই; তৎসঙ্গে সমুদয় পরিবারমণ্ডলের ফল। সমুদয় পরিবার কেন, প্রতিবাসিগণেরও ফল আছে—তাঁহারা সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আইসেন—ক্ষণিক সংসার ভুলিয়া গিয়া পূজাতে মাতিতে আইসেন।

পুরোহিত ঠাকুর, বিষয়ীর প্রবৃত্তি-অনুসারে তাহাকে গড়িয়া আনেন। যে বিষয়ী ঘোর পাপ পথে প্রবৃত্ত—যে ধর্ম্মের কোন বন্ধন মানিতে চায় না—চার্ব্বাক বলিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তাহাকে তুমি কোন মতেই বাঁধিতে পারিবে না। যেমন আবদ্ধ ঘোটক সহসা বন্ধনমুক্ত হইলে তাহার সমস্ত তেজে দৌড়িয়া বেড়ায়—শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া আপনি থামিয়া যায়, তদ্রূপ ঘোর নারকী, পাপপথে যৌবনের উন্মত্ততায় যখন নরকের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে ধরিয়া রাখে? সে নিজে দেখিবে, পাপপথের কণ্টকে তাহার গাত্র ছড়িয়া গিয়াছে, গাত্রময় রক্তারক্তি, আসিয়া পড়িয়াছে ঘোর পঙ্কিল হ্রদে! সেই হ্রদ হইতে উঠিবার জন্য সে আপনিই চেষ্টা করিবে। চেষ্টা করিবে কাহার সাহায্যে? তখন পুরোহিত ঠাকুর আস্তে আস্তে অগ্রসর হন। যে বার-ব্রতে গৃহিণীকে নিরতা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বার-ব্রতের কথায় গৃহস্বামীকেও ক্রমে নিরত করেন—বার-ব্রত ঝাঁকিয়া উঠে।

দান ও উৎসর্গ-দ্রব্য বাড়িতে থাকে। পূজার অনুষ্ঠান বাড়িতে থাকে। ক্রমে যজমান পথে আইসে। তখন পুরোহিত আরও জোর করিতে থাকেন। পূজার আয়োজন বিস্তারিত করিয়া লন। সাধককে গড়িয়া আনিতে অগ্রসর হন। ক্রমে ক্রমে দেবপূজার অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকে। হিন্দু-সাধক, শৈশব হইতে যে পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিন থামিয়াছিলেন মাত্র, তাহাতে আসিয়া আবার যোগ দিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন।

হিন্দু যজমান যখন পাপপথে প্রবৃত্ত, তখনও তাহার পূজা-পদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয় নাই। তাহার শ্রাদ্ধ-তর্পণ এবং কৌলিক পূজাপদ্ধতি চলিতেছে। পুরোহিতের হিতব্রত কখন থামে না। পুরোহিত কেবল অবসর দেখিতেছেন, কখন যজমান সম্যক্‌রূপে ভক্তিপথে ঘুরিয়া আসিবে। পুরোহিত নিত্য আসিয়া পূজা করিয়া যান, সময়ে সময়ে বার-ব্রতের আয়োজন করেন, পূজার সময় বাড়ীতে ও পরিবারমণ্ডলে পৈতৃক পূজার বিরাট বিকাশ করেন। যজমানকে কিয়ৎ পরিমাণে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে কাজে কাজে যোগ দিতে হয়। কিছুকালের জন্য ভক্তি-পথে আসিয়া তিনি হৃদয়ের আনন্দ লাভ করেন। প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া যায়।

হিন্দু সংসারে ধর্মের এইরূপ শিক্ষাপথ বিস্তারিত আছে। গৃহীলোকেরা আশৈশব এই পথের পথিক। সংসারে প্রবৃত্তি-পথে ভক্তি আরব্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপথে আইসে। তামসিক পূজায় যে ভক্তি নিষ্ঠাকার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে রাজসিক পথে উঠিতে থাকে। ভদ্র সমাজের রাজসী ভক্তি ক্রমে

সাত্ত্বিকা হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। হিন্দু আশৈশব যেরূপ ভক্তিপথে শিক্ষিত, তাহাতে তাহার সাধনাপথ অনেকাংশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই স্থলে হিন্দুজাতির সহিত অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতির ভিন্নতা লক্ষিত হয়।

বঙ্গে সকাম উপাসনা।

হিন্দু প্রবৃত্তিপথে প্রথমে সকাম উপাসক বটে; কিন্তু হিন্দু সকাম উপাসক, আর অপর ধর্ম্মীয় সকাম উপাসকে অনেক প্রভেদ। ইউরোপীয় জনসমাজের তমোগুণ-প্রধান ঐহিকতার সহিত হিন্দু-জনসমাজের ঐহিকতার তুলনাই হয় না। খৃষ্টীয় জনসমাজ ঘোর স্বার্থপর ও পৃথ্বীধূলায় ধূসরিত। পার্থিব ইষ্ট তাহার সর্ব্বস্ব। পার্থিব মঙ্গল-বিধানার্থ ইউরোপীয়গণ যত ব্যস্ত, অন্য জাতি বুঝি তত নহে। তাহারা তজ্জন্য পৃথিবী তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। হা অর্থ যো অর্থ, হা সুখ যো সুখ করিয়া পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপীয় সমাজ এইরূপ অনিত্য ঐহিকসুখে নিমজ্জিত। হিন্দুসমাজ বোধ হয় ততদূর পার্থিবসুখে নিরত নয়। বড় পরিতাপের বিষয় যে, ইদানীন্তন এই হিন্দুভাব ইংরাজীশিক্ষা ও ইংরাজীআদর্শ-প্রভাবে অনেকদূর বিনষ্ট হইয়া আসিতেছে। এজন্য এ শিক্ষাকে আমরা কুশিক্ষাই বলিয়া থাকি। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের পারমার্থিকতা কিছু অধিক। তাহা মূলেই যে পারমার্থিক স্তরে দণ্ডায়মান, সে স্তরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজকে উঠিতে অনেক সাধনার প্রয়োজন। হিন্দুসমাজ আমূলে অনেক উন্নত পারমার্থিক ভাবে গঠিত। হিন্দুজাতি শৈশব হইতে দেবদেবতায় আসক্ত।

হারা যতদূর দেব-প্রাণগত, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ততদূর হ। দৈববলের উপর হিন্দুজাতির সমস্ত নির্ভর। হিন্দুজাতি ই পারমার্থিক স্তরে দাঁড়াইয়া সকাম। খৃষ্টীয় জাতি যে বে সকাম, হিন্দুজাতি তদপেক্ষা অনেক উন্নত সকাম। হার সকামপূজা দেবোৎসর্গে ক্রমে উন্নত হইয়া আইসে। দে যে কিয়দংশ সকামের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, সে সকামে ষয়া হিন্দু-ভক্তির নিষ্ঠা, দেবতায় ঐকান্তিকতা ও আত্ম-সমর্পণ ষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই। তদ্রূপ সকামের ছায়া হিন্দু-প্রবৃত্তি থের উপাসকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে সকাম নিষ্কামোন্মুখ। ষ্টীয় উপাসকের সকাম-ভাবের তুল্য হিন্দুর সকামভাব নিন্দনীয় হে। তবে যাহারা তত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা বোধ র ইউরোপীয় সকামকে সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু-সকামকে একে-রে অধস্তলে দেন। হিন্দুর সকাম হিন্দুর প্রবৃত্তি-স্রোতকে পৃথিবী হইতে স্বর্গের পথে ফিরাইয়া দিয়া তাহার চিত্তকে পার্থিব র্থ হইতে পারমার্থিক ধনলালসায় প্রবৃত্ত করে। এই পারমা-র্থিক ধনলালসা বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়া হিন্দুর সমস্ত প্রবৃত্তিকে দেবোন্মুখী করে। কামনা পৃথিবী হইতে স্বর্গে উঠে, স্বর্গে উঠিয়া দেবাদর্শে তাহা বিশ্বরূপিণী হইয়া বিষ্ণুভক্তিতে পরিণত হয়। তখন কামনা পরিশুদ্ধ হইয়া কেবল ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়।

সকাম হইতে নিষ্কাম।

হিন্দুর সকাম কতদূর উন্নত, ধ্রুবচরিত্রে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। ধ্রুবের জননী নিতান্ত অন্তর্বেদনায় ধ্রুবকে রাজপদ অপেক্ষাও যে উচ্চপদ পাইবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছিলেন,

সেই পদলাভ করিবার জন্য—যে পদে উঠিলে রাজমুকুটও অব-নত হয়—যে পদের গৌরবে রাজসিংহাসনও নিষ্প্রভ—সেই দেব পদ লাভের জন্য ধ্রুব উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যই সেই তপস্যা সকাম। সকল নিষ্কামের মূলে এই সকাম বর্ত্তমান। এই সকাম ধ্রুব-জননীর প্রবৃত্তি—প্রকৃত ভক্তিদেবীর প্রবৃত্তি। নিষ্কাম হইতে যাইব যে মুক্তির জন্য, সেই জন্য এই সকাম। এই সকাম জীবকে দেবত্বে উপনীত করে, শুদ্ধ দেবত্ব নয়, দেবত্বের ধ্রুবত্বে উপনীত করে। প্রবৃত্তি-পথিকের জন্য এই উচ্চ আদর্শ। ঘোর বিষয়ীর জন্য এই আদর্শ। এই আদর্শ কেবল হিন্দু রাজরাণীর সমক্ষে বিদ্যমান। হিন্দু রাজরাণীও কত পারমার্থিক উচ্চস্তরে বসিয়া থাকেন, তাহা আমরা ধ্রুব-জননীর দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গসমাজে আজিকার দিনেও বিরল নহে। হিন্দুসমাজের ধর্ম্মশিক্ষা এইরূপ রাজরাণীর সৃষ্টি করে। সে শিক্ষা পুঁথীগত বিদ্যা নহে—কেবল গ্রন্থাধ্যয়ন নহে। হিন্দু পরিবারমণ্ডলে যে ভক্তির অনুষ্ঠানাদি ও আদর্শ আছে, সেই ভক্তিপথের শিক্ষাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষা। * এই আদর্শের মোহে মানুষ রাজ-সিংহাসনও পদদলিত করিয়া দেবত্বে উঠিয়া যায়। প্রহ্লাদও রাজসিংহাসন পদদলিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে এবং নিষ্কাম ধর্ম্মে যে পদে উপনীত হইয়াছিলেন—যে ভক্তি-ঐকান্তিকতায়, যে সমদর্শিতায়, যে ভগবৎ-তন্ময়তায় আসিয়াছিলেন, ধ্রুব সেই দেবত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রভেদ এই,—প্রহ্লাদের

* এই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা কিরূপ তাহা "সাহিত্য-চিন্তায়' প্রদর্শিত হইয়াছে

দর্শে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, হৃদয়ের উচ্চতা, রসের প্রগাঢ়তা ; বের আদর্শে রিপু ও আসক্তির সংযম, কাঠিন্য ও তপের গ্রতা। একজন ভক্তিরসে সুন্দর, অন্যজন তপঃ-প্রভাবে দর। ধ্রুব দেবতা, প্রহ্লাদ মুক্ত। প্রহ্লাদে সকাম ভাবের দর্শন নাই, ধ্রুবের সকাম দেবত্বে উঠিয়া নিষ্কামে পরিণত হইলে হ্লাদের নির্ব্বাণ মুক্তিতে উপনীত করে। ধ্রুবকে ধরিয়া সারী সংসারের কঠিন পথ দিয়া যাইতে শিখেন ; প্রহ্লাদকে রিয়া সংসারী, ভক্তিরসে সকলকে গলাইয়া দিয়া বিঘ্ন-বিপত্তির ঝে কেবল অচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সে মস্ত বিঘ্ন বিনাশ-পূর্ব্বক সংসারপথেই বিষয়-ভোগের শেষে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন। গৃহীর কাছে দুইজনেই ক্ষক। কিন্তু ধ্রুব শুষ্ক শিক্ষক নহেন, প্রবৃত্তি-পথিকের কটস্থ আত্মীয় স্বজনও বটে। যাঁহার ভক্তি অত্যন্ত প্রবলা, তনি প্রহ্লাদকে লইবেন। আর যাঁহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা, তনি ধ্রুবকে লইবেন। উভয়ই পৌরাণিক সৃষ্টি—পুরাণের াদর্শচরিত।

বঙ্গসমাজে ব্যাস ও বাল্মীকি।

পুরাণ সমস্ত এইরূপ আদর্শ-চরিতে পরিপূর্ণ। তাহাতে যেমন দেবদেবীর সৃষ্টি আছে, তেমনই অনেক আদর্শ ভক্ত-চরিতের বর্ণনা আছে। পুরাণের এক দিকে দেবদেবীর সৃষ্টি, অন্য দিকে দেব-সাধকগণের সৃষ্টি। সাধকের প্রবৃত্তি-ভেদে বিভিন্ন সাধন-পথ ; নহিলে গন্তব্য স্থান একই। সেবকগণের সাধন-পথ ঘটনা-পরম্পরায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনা-পরম্পরায় ভক্তির

বিকাশ প্রদর্শন করিবার জন্য নানা অদ্ভুত কল্পনা পুরাণে সন্নিবেশিত। * ব্যাসের এই সমস্ত আদর্শ-চরিত হিন্দুর কল্পনায় সতত বিরাজিত। কাহারও অলৌকিক দয়া, কাহারও প্রেম, কাহারও ভক্তি, কাহারও নিষ্ঠা, কাহারও শ্রদ্ধা, কাহারও পিতৃভক্তি, কাহারও মাতৃভক্তি—মানবের যত দেবভাব, যত উচ্চভাব—সেই উচ্চভাবে তাহারা ধর্ম্মবীর। এই ধর্ম্মবীরগণের বীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য যত ঘটনার সৃষ্টি। এই সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারে এক এক ধর্ম্মবীরের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমস্ত চিত্র হিন্দুগৃহীকে সততই পুণ্যপথে উত্তেজন করিতেছে—কল্পনায় জাগরূক থাকিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দু-গৃহে শুদ্ধ দেবদেবীর পূজা নহে, এই সমস্ত চরিতেরও পূজা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে, যাত্রায়, ভজনে, কথকের কথকতায়, ছবিতে, পুরাণপাঠে এবং পিতামহীর রূপকথায় তাহাদের গুণব্যাখ্যা সততই চলিতেছে। রূপ কথার অর্থ ই—এই সমস্ত আদর্শ রূপের কথা। হিন্দুগৃহিগণ অন্নপানের মত এই সমস্ত কথা প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছেন—সাংসারিক আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের স্মরণপথে তাহারা অহরহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সে সমস্ত চরিত ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া হিন্দুগৃহীকে গড়িয়া আনিতেছে।

ব্যাসের পৌরাণিক আদর্শচরিত সমস্ত মানবকে যেমন দেবত্বে আনিবার জন্য অহরহ তাহার কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে, বাল্মীকির রামায়ণও তেমনি হিন্দুর গৃহে গৃহে অধীত

* অদ্ভুত কল্পনা পুরাণে কেন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার ফল কি, এ সকল বিষয় "সাহিত্য-চিন্তায়" আলোচিত হইয়াছে।

তেছে; অধীত হইয়া ভক্তির কি জাজ্বল্যমান চিত্র সকল নসচক্ষে অঙ্কিত করিতেছে। সে চিত্র সমুদয় কোন হিন্দু গন ভুলিতে পারেন না। সে সমুদয় চিত্র সহস্র সহস্র বৎসর রিয়া সমভাবে নবীন ও সতেজ রহিয়াছে। হিন্দু গৃহীকে ভক্তি ক্ষা দিতেছে। হিন্দুর গৃহে সীতাদেবীকে গড়িতেছে, লক্ষ্মণের মান সহোদরকে গড়িতেছে, হনুমান ও বিভীষণের সমান ক্তকে গড়িতেছে। বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাণ্ডিল্য, গাচার্য্য, উদ্ধব ও বলি প্রভৃতি সমস্ত ভক্তির আচার্য্যগণ হিন্দুর ংসারক্ষেত্রে যেন জীবিত লোকচরিত্র রূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন। ভক্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-ংযম শিক্ষা দিয়া সংসারীকে পুণ্যপথে আনিতেছেন।

হিন্দুসমাজ নিয়ত ভক্তিগীতে প্রতিশব্দিত হইতেছে। কোথাও দেবলীলা সঙ্গীত হইতেছে, কোথাও পৌরাণিক আদর্শ-চরিত সংকীর্ত্তিত হইতেছে। বঙ্গসমাজে ব্যাস ও বাল্মীকি, পুরাণ-হস্তে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কীর্ত্তনে শুক ও জয়-দেব গাহিতেছেন, যাত্রায় পৌরাণিক বীরগণ বঙ্গসমাজের সমক্ষে ভক্তির অভিনয় করিয়া দেবসঙ্গীতে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার কথকতায় দেশশুদ্ধ লোক মোহিত হইয়া আছে।

বঙ্গসমাজে পূজা ও কথকতা।

বঙ্গসমাজে একদিকে পূজার ধূমধাম, অন্যদিকে পৌরাণিক আদর্শ চরিতের গুণকীর্ত্তন। এইরূপে সমস্ত পৌরাণিক কাব্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্ত জন-

পদকে শিক্ষা দিতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত এই শিক্ষাধীন, আবালবৃদ্ধবনিতা এই শিক্ষাধীন। ভক্তির পথে সবাই সমান অধিকারী। এই ভক্তির পথ জ্ঞানীর জন্ম যেমন, অজ্ঞানী, মূর্খ ও নারীর জন্যও তেমন। সমাজের সর্ব্বসাধারণের জন্য এই ভক্তি পথ। পুরোহিত পূজায় আসীন হইয়া চারিদিকে ভক্তির উপহার স্বরূপ নৈবেদ্যমাঝে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে সমস্ত দর্শকগণের মন মোহিত করিতেছেন। আবার যখন ভক্তিদীপ জ্বালিয়া দেবীকে আরতি করিতেছেন, তখন কি সমস্ত সমাগত লোক করপুটে তাঁহার চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চিত্রার্পিত নয়নে সব সন্দর্শন করিতেছে না? তখন বোধ হয়, দর্শকমণ্ডলী ভক্তিরসে গলিয়া অবাক হইয়া দেবাবির্ভাব * উপলব্ধি করিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর পূজায় দর্শকমণ্ডলীকে যেমন ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন, কথক ঠাকুর তাঁহার বাক্‌পটুতায়, অঙ্গাভিনয়ে এবং সঙ্গীতে তেমনই ভক্তিরসের উদ্দীপন করিতেছেন। উপস্থিত জনগণ মোহিত হইয়া সবই শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন এমত নহে, ভক্তিরসের উদ্দীপনায় কখন কাঁদিতেছেন, হাসিতেছেন, উৎফুল্ল হইতেছেন, কখন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতেছেন। বঙ্গসমাজের কথকতা এক মহাশক্তি, রসোদ্দীপনের মহা উপায়। এই কথকতা কোন দেশে নাই, কোন ধর্ম্মে নাই। পুরাণ এই কথকতার সৃষ্টি করিয়াছে।

সঙ্কীর্ত্তন।

আর সঙ্কীর্ত্তন—কীর্ত্তনাঙ্গ—যাহার মাধুর্য্যে মন গলিয়া যায়—

---

* অর্চনাকারীর তপোযোগ অনুসারে দেবাবির্ভাব ঘটে। যাহার যেমন তপস্যা, তাহার ফল তদ্রূপ।

যাহার সমান মধুর ও মনোমুগ্ধকর আর বুঝি কিছুই নাই—যাহার সঙ্গীতে সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হয়—সেই কীর্ত্তনাঙ্গ কোন্ দেশে আছে? গম্ভীর খোল করতালের তালে তালে যখন হরি-কীর্ত্তন সঙ্গীত হইতে থাকে, তখন কি মন সেই তালে নাচিতে থাকে না? সেই কীর্ত্তন সুধু বঙ্গদেশের সম্পত্তি—বঙ্গসমাজের ভক্তিরসোদ্দীপক মহাশক্তি। ভাগবত ও অপরাপর পুরাণাদি এবং জয়দেবের কাব্যামৃত এই শক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়া বুঝি নারদের বীণাবাদিত ধর্ম্মগীতের মধুরতা বঙ্গদেশে দিয়া লোকসমাজকে উন্মত্তপ্রায় নাচাইয়া অমৃতবর্ষণ করিতেছে।

বঙ্গসমাজে রামপ্রসাদ।

এই সমস্ত শক্তি বঙ্গদেশের ধর্ম্মশিক্ষাদাত্রী। এই সমস্ত শক্তি-প্রভাবে বঙ্গদেশে ভক্তির প্রস্রবণ অহরহ প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত শিক্ষাশক্তি বঙ্গবাসী জনগণকে নানাবিধ ভক্তিরসে আসক্ত করিতেছে। কেহ কেহ রূপাসক্তিতে মোহিত হইয়া ভগবানের রূপ-বিশেষের ধ্যান ও ধারণায় উন্মত্ত। গোপীগণ যেমন শ্যামরূপে আসক্ত ছিলেন, তাঁহারা তদ্রূপ ভগবানের রূপবিশেষের পক্ষপাতী হইয়া সেই রূপেরই ভজনা ও সাধনা করিতেছেন। হনুমান যেমন রামরূপে আসক্ত, নারদ যেমন কৃষ্ণরূপে তন্ময়তালাভ করিয়াছিলেন, তেমনই রূপাসক্তি বঙ্গসমাজের ভক্তিপ্রবাহে বহিতেছে। নিমাই কৃষ্ণরূপের এবং রামপ্রসাদ কালীরূপের ভক্ত ছিলেন। কাহার বা পূজাসক্তি প্রবলা। পৃথুরাজ যেমন পূজাসক্ত ভক্ত ছিলেন, কেহ বা সেইরূপ পূজার উৎসবে পরিপূর্ণ। কেহ বা দাস্যভাবে ভগবানের সেবায় নিরত—

যে দাস্যভাব হনুমানে এবং বিদুরে প্রকটিত। কেহ রাম-প্রসাদের ভক্তিভাব সঞ্চারের জন্য অনুদিন সাধনা করিতে-ছেন। তেমনই ধর্ম্মতেজ, তেমনই বাৎসল্যরস, তেমনই দাস্য-ভাব, তেমনই পিতৃ ও মাতৃভক্তিসম দেবভক্তি, তেমনই ভগবানকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করা, তেমনই বৈরাগ্য, তেমনই শান্তি-সুখের সঞ্চার-লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। যে ভাব যখন প্রবল হইতেছে, সেই ভাবের রামপ্রসাদী গানে ভক্তিরসের সঞ্চার করিতেছেন। তাই বঙ্গসমাজ সময়ে সময়ে রামপ্রসাদী গানে প্রতিধ্বনিত। সেই প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসের উদ্রেক। সেই ভক্তি-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজ রাম-প্রসাদের ধর্ম্মতেজ উপলব্ধি করিতেছে। সেই সঙ্গীতে মিশিয়া গিয়া মা বলিয়া দেবতার কাছে সন্তানের আবদার জানাই-তেছে—পিতা বলিয়া ভক্তির আরাধনা করিতেছে। রাম-প্রসাদ ভগবানের পিতৃ ও মাতৃরূপ-ধ্যানে বঙ্গধামকে পূর্ণ করিয়া-ছেন। কোন্ সাধক তত জোর করিয়া, তত স্পর্দ্ধার সহিত ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকট ভগবান মাতৃরূপে এবং পিতৃরূপে দেখা দেন। শ্যাম, শ্যামা হয়েন। রাধার নিকট যে শ্যাম শ্যামা, রামপ্রসাদের নিকট সেই শ্যাম শ্যামা। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে না পারিলে বুঝি ভক্তের হৃদয় পূর্ণ হয় না। নহিলে তিনি নিজে অলিঙ্গ।

পার্থিব জনক জননীকে যিনি যথার্থ ভক্তি করিতে পারেন, তিনিই সেই ভক্তি হইতে জগন্মাতা এবং জগৎ পিতাকে ভক্তি করিতে শিখিতে পারেন। যখন আমরা সেই জগন্মাতা ও জগৎ-পিতার সন্তান হই, তখন আর পার্থিব জনক জননী সে ভক্তি-

াগরে থাই পান না—তাঁহারা বুঝি ডুবিয়া যান। তখনই ভক্ত
থার্থ ভগবানের সন্তান এবং সেই সন্তানই ভগবানকে আবদারের
হিত মা বাপ বলিয়া ডাকিতে পারেন। বঙ্গসমাজ প্রসাদী
াতে এই দেবভক্তি-রসে মগ্ন হইয়া যাইতেছে, আবার কখন বা
সই প্রতিধ্বনিতে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতেছে।
ামপ্রসাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাঁহার ভক্তিরসে মিশিয়া যে
াঙ্গীতসুধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তুলে।
জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ভক্তিরসে ডুবিয়া যায়, ভক্তিরসই হৃদয়কে প্রমত্ত
করে। প্রমত্ত করিয়া দিয়া জ্ঞানের উদ্রেক করে। জ্ঞানে
আমাদের চৈতন্য হয়। চৈতন্য আবার ভক্তিরসের সঞ্চার করে।
রামপ্রসাদ এই সমস্ত রসের আধার ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-
প্রবাহে বঙ্গসমাজ আর্দ্র।

বঙ্গসমাজ ভক্তির রাজ্য।

বঙ্গসমাজ ব্যাস ও বাল্মীকির পৌরাণিক ভক্তির ধর্ম্মরাজ্য।
যে রাজ্যে ব্যাস ও বাল্মীকির অধিকার, সে রাজ্যে কি আর
কোন গুরু স্থান পান? ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাস এবং বাল্মীকির
সমান কে? ভক্তির মাহাত্ম্য ও দার্শনিক তত্ত্ব শাণ্ডিল্য এবং
নারদ অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভক্তির ক্রমোন্নতি,
সংযমী-সাধনা, ভক্তির পরিপাক ও পরিণতি, তাঁহাদের ভক্তিসূত্রে
অতি পরিপাটীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভক্তিতত্ত্ব ভারত ভিন্ন
আর কোন দেশে এবং হিন্দু ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে
পাওয়া যায় না। আর কোন ধর্ম্মপ্রণালী ভক্তির রীতিমত
পথ দেখাইয়া মোক্ষধামে লইয়া যায় না। ভারতের এবং হিন্দুধর্ম্মের

এই বিশেষ সম্পত্তি। এই সম্পত্তির ঐশ্বর্য্যে হিন্দুধর্ম্ম পরিপূর্ণ—হিন্দুধর্ম্মের বিকাশ। সেই ঐশ্বর্য্যরাশি বঙ্গসমাজের প্রভূত ধনসম্পত্তি। বঙ্গসমাজের এত পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান এবং এত ধূমধাম কেবল সেই ভক্তিরসের বিকাশ। অন্য দেশে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ এই ভক্তিতত্ত্ব জানেন না ও বুঝেন না বলিয়া, কর্ম্মকাণ্ডের এই পূজাপদ্ধতি ও পৌরাণিক নিগূঢ় তত্ত্ব-বিকাশের মর্ম্মাবগত হইতে পারেন না। এই ভক্তিরসে সমস্ত হিন্দুজাতি নিমগ্ন। মহা জ্ঞানিগণও এই পথের পথিক। দেবর্ষি নারদ, গর্গাদি ঋষি, মহর্ষি ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি এই ভক্তিপথের পথিক। এমন সহজ সাত্ত্বিক সংযম-পথ আর নাই। তাই এই পথ সর্ব্বসাধারণের জন্য উপযোগী হইয়াছে। সামান্যা, নিরক্ষরা গোপীগণ পর্য্যন্ত এ পথের অনুবর্ত্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছেন। এ পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, মান এবং ধনের আবশ্যকতা নাই; বল, বীর্য্য ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের। সেই হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ এ রাজ্যের মহা মহা ধর্ম্মবীর হইয়া গিয়াছেন। পুরাণে সেই ভক্ত বীরগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনাতন কালেও অনেক ভক্ত-মহাবীর জন্মিয়া এই রাজ্য আলোকিত করিয়াছেন। *

এই ভক্তির বিরাট বিকাশ, বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্ম্মশিক্ষার

---

* চৈতন্য দেবের ভক্তিলীলা বঙ্গদেশের এক বিশেষ সম্পত্তি। বঙ্গসমাজে এই লীলার বিশেষ বিস্তার। চৈতন্য দেবের প্রেমলীলা বঙ্গসমাজকে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার কেমন ভক্তিপথেরই উপযোগী, "সাহিত্য-চিন্তায়" তাহা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। এ প্রস্তাবেও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

গুলির। ধর্ম্মশিখিবার জন্য বঙ্গ-সমাজকে আর কিছুর এবং আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি যদি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতে চাও, যদি ইউরোপীয় দর্শনতত্ত্বে মহাপণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতে চাও, তবে যাও, যেখানে হিন্দুধর্ম্মের মহা জ্ঞানবীরগণ বসিয়া আছেন, সেই খানে একবার তাঁহাদের সহিত আলাপ কর—বৃহস্পতি, * কপিল, কণাদ, অক্ষপাদ, ব্যাস ও শঙ্করের সহিত আলাপ কর—আলাপ কর বশিষ্ঠ, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত। আলাপে তোমার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই ভক্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ কর। এ পথে সংযম শিক্ষা কর, সংযমী হইতে পারিলে সহজে দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবর্ষি নারদ তোমাকে এই শান্তিপথে আহ্বান করিতেছেন।

---

* হিন্দু দর্শন-শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বেদকে অনুমান-দ্বারা প্রতিপন্ন করে। হিন্দু দার্শনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন কোন কথা কহিতেন না। প্রমাণ-পথ সাজাইতে হইলে নাস্তিবাদের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পূর্ব্বপক্ষ না থাকিলে উত্তর পক্ষ সাব্যস্ত হয় না। বৃহস্পতি চার্ব্বাকবাদে সেই পূর্ব্বপক্ষের সৃষ্টি করিয়া দার্শনিক প্রমাণ-পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চার্ব্বাকবাদ না হইলে দর্শনশাস্ত্র সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বেদ-মূলক হিন্দুধর্ম্ম দার্শনিক অনুমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

কাব্যে—ধর্ম্মসাধনা।

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গসমাজে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা প্রায় শ্রবণ-গোচর হইত না। তাহা হিন্দুশাস্ত্রে ও প্রধান পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। আজিকার দিনে ছেলে-বুড়ো, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, অধিকারী-অনধিকারী, স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই মুখে শুনিতে পাইবে—নিষ্কামধর্ম্ম, যোগ, ভগবদ্গীতা ও মুক্তি। আমরা জানি, নিষ্কাম ধর্ম্ম ও যোগ, অতি গুরুতর বিষয়। নিষ্কামধর্ম্ম এত উচ্চ বিষয়, যোগ এত দুর্ঘট যে, সে সকল কথা ছেলেখেলা নয়। সামান্য লোকের সহিত প্রকৃত যোগীর আকাশ-পাতাল ভেদ। মায়ামুগ্ধ সংসারীর সহিত নিষ্কামীর প্রভেদ হিমালয় হইতে কুমারী-অন্তরীপ। বিষয় অতি উচ্চ, জিনিষ অতি উত্তম, কিন্তু অত্যন্ত দুর্লভ। নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিতে অতি মিষ্ট এবং কল্পনাতে অতি পবিত্র, কিন্তু সে মধুর রব দৈববাণীর ন্যায়, আর সে পবিত্রতা কবির কল্পনার ন্যায়। কোথায় আমরা সংসারের ঘোর মায়ায় আবদ্ধ, কোথায় ঋষি-চরিত্রের নির্লিপ্ত নিষ্কাম ভাব! সে ভাব সুদূর শান্তিময় স্বর্গবাসে রহিয়াছে, আর আমরা পড়িয়া রহিয়াছি, দুঃখময় পৃথ্বীতলে। স্বপ্নবৎ সে ভাব নিদ্রাকালে সত্য বোধ হয়, কিন্তু জাগরণে দেখি, সে স্বপ্ন আকাশকুসুমবৎ চন্দ্র-লোকে মিলাইয়া গিয়াছে।

নিষ্কামধর্ম্মের মহা কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রে পড়িতে বেশ, শুনিতে বেশ কিন্তু কয় জন সে যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন? দশ বিশ হাজারের মধ্যেও একজন নিষ্কামী হইতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু না পারিলেও আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ ব্যাস ভগবদ্গীতায় দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের দিকে যাঁহারা সমাজের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের পরম মিত্র। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! সে আদর্শে উঠিবার সোপানও ব্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের সোপান সকাম প্রবৃত্তিপথ। এই সকাম প্রবৃত্তিপথের পথিক সাধারণ লোকসমাজ ও সংসারী জনগণ। তাহাদের জন্যই বিস্তারিত পুরাণ-শাস্ত্র। গীতা এক খানি, পুরাণ আঠার খানি। কারণ, প্রাকৃত জনগণের সংখ্যাই অধিক। সেই প্রাকৃত জনগণের বিভিন্ন রুচি-অনুসারে বিভিন্ন প্রবৃত্তিপথ প্রদর্শন করাই বিস্তৃত ও বহুবিধ পুরাণের উদ্দেশ্য।

আমরা যে সকাম সংসার-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত, প্রবৃত্তি-পথের যে বিশাল রাজ্যে আমরা পরিবৃত, অগ্রে আমাদের তাহার সমুদয় ভাব তন্ন তন্ন জানা ও বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা যাই, নিষ্কাম-তত্ত্বের অন্বেষণে। যাহা আমাদের সতত অনুষ্ঠেয়, যে ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সে সমস্ত বিষয় আমরা তুচ্ছ করিয়াছি, করিয়া যাহা হয় ত আমরা কখন লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া একান্ত ব্যস্ত, তাহারই আলোচনা দিন-রাত। কিন্তু যাহার আলোচনা দিন রাত করা আবশ্যক, তাহা পড়িয়া রহিল; পড়িয়া রহিল এমত ভাবে, যেন

তাহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। সকাম ক্রিয়াকল্পাণ, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, ভক্তি-সাধক শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান, শালগ্রামাদি দেবপূজা, বার, ব্রত ও পার্ব্বণ, এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই ব্যাপৃত, অথচ এ সমস্ত বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োজন কি, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা একেবারে নির্ব্বাক। ক্রিয়াকলাপ ও দেবপূজাদির রহস্য ও অর্থ বোঝে না বলিয়া অনেকে তাহা ছেলে-খেলা বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই ভক্তি-পথ ও নিষ্কামধর্ম্মের সোপান।

ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতাদি পাঠ করিয়া ভক্তি-পথের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সমুদয় শাস্ত্রালাপের সহিত পুরাণাদি পাঠ করাও বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—শাণ্ডিল্য-বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি ও ব্যবহার-শাস্ত্রাদি। তাহাদের আদর অগ্রে; অগ্রে এই জন্য যে, তাহাদের সহিত আমরা নিকটসম্বন্ধে আবদ্ধ। উচ্চাধিকার জন্মিলে তখন উচ্চ বিষয়ের আলোচনা। অগ্রে আমাদের গৃহে ও তৎপার্শ্বে কি আছে তাহা জানিয়া তবে দূরের সম্বাদ লওয়া উচিত। সর্ব্ববিষয়ে আমরা এইরূপ অনভিজ্ঞ। নিজ ভারতের বিষয় আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু সুদূর ইংলণ্ড বা আমেরিকার খবর আমরা ভাল জানি। ধর্ম্মালোচনা-সম্বন্ধে ঠিক আমরা তাহাই করি।

এক্ষণকার ইংরাজী-শিক্ষিত কৃতবিদ্য জনগণের নিকট সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি তত আদরণীয় নহে। তাঁহাদের চক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অধিকতর। তাঁহাদের অভাব কেবল সেই ভক্তি, যে ভক্তির সাহায্যে নিষ্কাম পথে উঠিতে পারা যায়। নিষ্কাম

ধর্ম্মের মূল যাহা, তাহাই নাই। নিষ্কামধর্ম্ম ত মুখের কথা নয় যে, সে ধর্ম্ম কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে পারিলেই চিত্ত অমনি নিষ্কামভাবে পরিপূর্ণ হইবে? দৃঢ় ঈশ্বরানুরাগই নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল। অনুরাগ কখন মুখের কথায় উদয় হয় না। ভালবাসা, প্রীতি, কি দয়া বলিবামাত্র উপস্থিত হয় না। জোর করিয়া কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না। সংসারে সামান্য বিষয়ে যাহা সত্য, ঈশ্বর-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। যাহা দেখিতেছি, শুনেতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ত সে কথা অধিকতর খাটে। যাহা দেখিতেছি, তাহাকে যদি আমরা মনে করিলেই ভালবাসিতে না পারি, তবে যাহা কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহাকে কিরূপে ভালবাসিতে পারিব? যাহা দেখিতেছি, তাহাকে যত শীঘ্র ভালবাসিতে পারি, অদৃশ্য পদার্থকে তত শীঘ্র ভালবাসিতে পারি না। এজন্য, হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু আচার-ব্যবহারে অগ্রে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ, গুরু, পিতা, মাতা এবং (স্ত্রীর পক্ষে) পতিভক্তি শিক্ষা দেয়। যিনি সাক্ষাৎ দেবতা পিতা-মাতা বা পতিকে ভালবাসিতে না পারেন, তিনি অসাক্ষাৎ দেবতাকে কিরূপে ভালবাসিবেন? অসাক্ষাৎকে সুস্পষ্ট জ্ঞানপ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধিরূপে প্রতীত করিতে হইবে। তাই ঈশ্বর-ভক্তি উদয় হইবার পূর্ব্বে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। সেই জ্ঞান এরূপ হওয়া চাই যেন, অন্তর্দৃষ্টিতে ঈশ্বর তাঁহার শান্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই জাজ্বল্যমান থাকেন। শুদ্ধ জাজ্বল্যমান নয়, অতি মনোহর মূর্ত্তিতে জাজ্বল্যমান থাকেন।

এই ঈশ্বরপ্রীতি জন্মিবার পূর্ব্বে আমাদের কি কি চাই, তাহা আমরা বলিতেছি।

চিত্ত-শুদ্ধি।

প্রবৃত্তি-পথে লোক কেবল ঐহিক সুখেরই অভিলাষী থাকে। এই প্রবৃত্তি-স্রোতকে ঐহিক সুখের দিক হইতে পারত্রিক সুখের প্রতি প্রথমে নিয়োজিত করা আবশ্যক। অভ্যাস-বশতঃ ক্রমে পারত্রিক সুখ-লক্ষ্যও তিরোহিত হয় এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনের আনন্দ জন্মে। তখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সহজ ও অভ্যস্ত হইয়া আইসে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি সাধন করা অত্যাবশ্যক।

চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ বঙ্গসমাজে দ্বিবিধ প্রশস্ত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে—এক বিধ শাক্তের পূজাদির ব্যবস্থা, অন্য বিধ বৈষ্ণব রাগ-মার্গ। আমাদিগের মুনি ঋষিগণ জানিতেন, জনসমাজ নানাবিধ রুচি-বিশিষ্ট লোকসমূহে পরিপূর্ণ। নানাবিধ রুচির পক্ষে এক-মাত্র পথ সুখসেব্য হইতে পারে না। নানাবিধ রুচির উপযোগী বিভিন্ন সাধন-পথ চাই। এজন্য হিন্দুসমাজে যেমন নানাবিধ মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত, তদ্রূপ নানাবিধ সাধন-পথও প্রচলিত। অন্যান্য ধর্ম্মে নানাবিধ সাধনপথ নাই বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ভক্তিরাগ তত প্রবল নহে। এজন্য হিন্দুসমাজস্থ প্রাকৃত জনগণ অন্য ধর্ম্মীয় প্রাকৃত জনগণ অপেক্ষা অধিকতর ভক্তিশীল ও শান্তস্বভাব। নিজ নিজ প্রবৃত্তি-অনুসারে হিন্দুগণ ধর্ম্মসাধনপথ অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম-পালনে চিরদিন ব্রতী থাকেন। সেই পথে যিনি অনুরাগের বৃদ্ধি করেন, তিনিই ক্রমশঃ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সেই জন্য ব্যাস পূজার সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গর্গাচার্য্যাদি শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন ও হরি

কথাদিতে অনুরাগের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-দেব পূর্ব্বতন শাক্তবঙ্গে বৈষ্ণব-সাধন প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পথের সম্যক্ আলোচনা হওয়া এক্ষণে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এইরূপ একটি পথের পথিক না হইলে আমরা কখন ভক্তিতে সমুন্নত হইতে পারিব না।

যে পথের পথিক হও না কেন, চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্মে দুই বিধ শুদ্ধিপথ গ্রহণ করিতে হইবে—দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি। ইন্দ্রিয় বশীভূত না করিতে পারিলে মানসিক শুদ্ধি সঞ্জাত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের প্রাবল্য হ্রাস করিবার জন্য আহারের ও অপর বিষয়ের শারীরিক নিয়মাদি আবশ্যক। যিনি শুদ্ধাচার হইতে পারেন, তাহারই ইন্দ্রিয়-দমন সুসাধ্য হয়। শুদ্ধা-চার পবিত্রতা-সাধনের পরিষ্কৃত পন্থা। শুদ্ধাচারে থাকিলে একদা দ্বিবিধ নির্ম্মলতা সংসাধিত হয়। তাহাতে শারীরিক শুদ্ধি-সাধন এবং ইন্দ্রিয়দমনের সদুপায় হয়। কারণ, যিনি দৈহিক শুদ্ধচারী, তাঁহার রুচি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতে থাকে। রুচি বিশুদ্ধ হইলে, অবিশুদ্ধ স্বেচ্ছাচার ও পাপের মলিনতায় ক্রমশঃ অরুচি জন্মে। এই স্বেচ্ছাচার ও পাপমলিনতা নিবারণ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়-বশ ও রিপু-দমন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। এই শুদ্ধাচার, আর্য্য-রীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট দেশাচারানুযায়ী হইয়া চলিলে সুসম্পন্ন হয়। আজ কাল ম্লেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই সমস্ত ম্লেচ্ছাচার আপাততঃ সুখ-সেব্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রাবাল্য জন্মে এবং শারী-রিক দুর্নিয়মের অভ্যাস হইয়া আইসে। সুতরাং ম্লেচ্ছাচার

চিত্তশুদ্ধির ঘোর অন্তরায়। আর্য্যধর্ম্মের সাধন-পথ নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সমস্তের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন না হইলে শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হওয়া যায় না। আর্য্য রীত্যনুযায়ী চলা এজন্য একান্ত আবশ্যক। এই শুদ্ধাচারে ভক্তি-পথ আরব্ধ হয়। যিনি আর্য্য শুদ্ধাচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের আশা করেন, তাঁহার আশা দুরাশা মাত্র। গোড়া কাটিয়া আগায় জলসেচন করিলে কোন তরু জন্মিতে পারে না। এজন্য ভক্তি-পথের ভিত্তি-স্বরূপ আর্য্য ধর্ম্মে অগ্রে অন্তর্বাহ্য শুচির নিয়মাদি নিয়োজিত হইয়াছে। যিনি ভক্তিপথে উঠিতে চান, তাঁহার শুদ্ধচারী হইয়া থাকা অগ্রে কর্ত্তব্য। এই শুদ্ধাচার হইতে ভক্তি-পথের তপস্যা আরব্ধ হয়।

মনের মালিন্য দূর করিতে না পারিলে ভক্তির উদয় সম্ভাবিত নহে। এই মনোমালিন্য অজ্ঞান ও পাপাসক্তিসম্ভূত। যত দিন পাপাসক্তি থাকিবে, তত দিন মনোমালিন্য অনিবার্য্য। মালিন্য বিদূরিত হইলে যখন চিত্তের পবিত্রতা ঘটে, তখনই ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে, প্রতিভাত হইবে যেমন স্বচ্ছমুকুরে সূর্য্যালোক। সেই পবিত্র মূর্ত্তি হিন্দুঋষির দেব দেবী—দেবী সরস্বতী, লক্ষ্মী, ভগবতী—দেব শ্যাম সুন্দরের মদনমোহন প্রেমময় রূপ এবং শিবময় মহাদেবের বিশদ ও শান্ত মুখ-মাধুরী। অগ্রে চিত্ত-মালিন্য দূর না করিয়া যিনি ভক্তি-সঞ্চারের আশা করেন, তাঁহার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য শাণ্ডিল্য ঋষি দ্বিবিধ সাধন-পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বুদ্ধির মালিন্য দূর করিবার নিমিত্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা এবং হৃদয় হইতে পাপাসক্তি

ীকরণার্থ গৌণীভক্তিমূলক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।
নের পরিপাক না হইলে ভগবদ্বিষয়ে সন্দেহ বা অজ্ঞান-
্য নিবন্ধন মালিন্য যায় না, এই মালিন্য না যাইলে
রের স্বরূপ ছবি মনে উদয় হয় না। তদ্রূপ পাপের
্য প্রায়শ্চিত্ত * এবং নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে
ধন পাপাসক্তি বিনষ্ট হয় না। শ্রবণ, মননাদি দ্বারা এই

* হিন্দুশাস্ত্র-মতে প্রায়শ্চিত্তের অন্তরঙ্গ-সাধন বা প্রধান অঙ্গ অনুতাপ, ার বহিরঙ্গ-সাধন বা সামাজিক শাসন প্রায়শ্চিত্তের বহিরনুষ্ঠান। বিষ্ণু-্রাণের ২ অংশ ৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ ্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদি-কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত; হরি-সংস্মরণ ্রম প্রায়শ্চিত্ত।" অন্তরঙ্গ অনুতাপই প্রধান, যেখানে অনুতাপ নাই, সেখানে প্রায়শ্চিত্ত বিধি নহে। প্রগাঢ় অনুতাপ হইলেও পাছে পাপী আবার পূর্ব্বপাপ আচরণ করে, এজন্য বহিরঙ্গ সামাজিক অনুষ্ঠান। মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্রে এই সামাজিক অনুষ্ঠান-মূলক প্রায়শ্চিত্ত-সর্ব্বসাধারণের জন্য বিধানিত হইয়াছে। উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাহা স্বতন্ত্র। বিষ্ণুপুরাণ বলেন—হরিসংস্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত। হরিস্মরণ নহে, "হরিসংস্মরণ"। "সংস্মরণ" কি? যতদিন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন হইতে পাপপ্রবৃত্তি একেবারে না তিরোহিত হয়, তত দিন এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত অহর্নিশ হরিস্মরণের নাম "হরিসংস্মরণ"। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ হরিস্মরণই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ হরিস্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, এইরূপ হরিস্মরণই তপস্যা। প্রায়শ্চিত্তেরও অর্থ সেইরূপ তপস্যা। আঙ্গিরস স্মৃতিতে আছে:—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্।"

প্রায়ঃ শব্দের অর্থ তপস্যা এবং চিত্ত-শব্দের অর্থ নিশ্চয়। স্বপ্নেশ্বর ৭৭ শাণ্ডিল্য-সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে তাই বলেন, এইরূপ তপোনিশ্চয়ার্থক প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য, অন্যপ্রকার কার্য্যে যে প্রায়শ্চিত্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা গৌণ।

দ্বিবিধ মালিন্য নিরাকৃত হইয়া থাকে। এরূপ অনুষ্ঠান ও অজ্ঞানতার নিরসন কত কাল করিতে হইবে? যত কাল না চিত্তশুদ্ধি জন্মে। একবার, দুই বার, তিন বার মাত্র করিলে হইবে না, যতবার না যত্ন সফল হয়, ততবার করিতে হইবে। যেমন যতক্ষণ না ধান্যের সমুদয় তুষ স্খলিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অবঘাত আবশ্যক, তেমনি যতদিন পর্য্যন্ত না সমুদয় চিত্তমালিন্য দূরীকৃত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সাধনা আবশ্যক। ভক্তির সাধন-পথ এতই কঠিন। নিষ্কাম ধর্ম্মে আসিবার পন্থা এতই দুরূহ।

সর্ব্ব স্থানেই এই মালিন্য দূর করিবার আবশ্যকতা হয় না। অনেক সরলচিত্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতই পরিশুদ্ধ ও ভক্তিশীল। স্ত্রীজাতির চিত্ত বিশেষতঃ এইরূপ। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হয় না। ভক্তের নিকট তর্ক নাই, অবিশ্বাস নাই, সন্দেহ নাই। তাহার চিত্ত স্থির। ঈশ্বর-প্রীতি তাহার চিত্তকে সরল করিয়াছে। ভক্তি-প্রভাবে তাহার কাছে পাপাসক্তি আসিতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রতি তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী। সেই কৃপাতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছেন। সর্ব্ব বিষয়েই ভগবানের কৃপা দেখিতে পান। এ পৃথিবী তাঁহার নিকট সৌন্দর্য্যময়। পুরাণে এইরূপ স্বাভাবিক ভক্তিভাবের প্রকটন আমরা গোপী-গণের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। যাহাদের ভালবাসা স্বাভাবিক, তাহাদের নিমিত্ত ভালবাসা সঞ্চারের উপায়-নির্দ্দেশ অনাবশ্যক।

স্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহাদিগের জন্য ক্তশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। নিষ্কাম ভাব তাহাদের সহজ-সত্য। ণ্ডিল্য বলেন, এই প্রকার সরল ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক ভক্তি ন্মান্তরের পুণ্য-ফল। এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। কল লোক যদি সহজেই পুণ্যবান, সাধু, সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ ইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এ পাপ-পৃথিবী স্বর্গ-াসে পরিণত হইত।

ভগবদ্ভক্তি।

প্রাচীন কালে হিন্দু ভক্তগণ এতদূর ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয় অধিক চিন্তা করিতেন না। তাঁহারা ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে হস্তামলক-বৎ প্রতীয়মান দেখিতেন। ঈশ্বর লইয়াই তাঁহাদের চিন্তা, রমণ, ক্রীড়া ও আনন্দ ছিল। যে ঈশ্বরকে পূর্ব্বতন ঋষিগণ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিতেন, তাঁহার উপাসনাই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য ছিল। সেই ঈশ্বরপ্রেমে তাঁহারা এতদূর ভোর হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শুদ্ধ মানস-প্রতিমা-রূপে রাখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই মানস-প্রতিমার স্থূল রূপের ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন। সেই স্থূল মুর্ত্তি লইয়া দিবারাত্র রমণ ও আনন্দ করিয়া তবে সন্তুপ্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের ভক্তি তৃপ্তিলাভ করিত না * । স্থূল মুর্ত্তিতে

---

* হিন্দুধর্ম্মে সাকার উপাসনা দ্বিবিধ—(সগুণ ঈশ্বরের) মানসিক সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা এবং প্রতিমাদি স্থূল সাকার উপাসনা। কেবল নির্গুণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনই নিরাকার উপাসনা।

ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ, ১—৪।

মনসংযোগ অধিকতর হয় বলিয়া তাহার আবশ্যকতা হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিময় ঈশ্বরকে তাঁহারা পূজা করিতেন নিজে শিষ্যগণ-সঙ্গে, পরিবার-মণ্ডলী মধ্যে এবং সমাজস্থ জনগণ লইয়া। এরূপে পূজা না করিলে তাঁহাদের আনন্দ জন্মিত না। সে আনন্দ কি তাঁহাদের হৃদয়ে ধরিত? শতধারায় উৎসারিত হইয়া সর্ব্ব সমাজে ব্যাপৃত হইত। সর্ব্ব সমাজকে ভক্তিপথে আনিত। তাই হিন্দুর নিকট মূর্ত্তিপূজার এত গৌরব, এত উৎসব। যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহারা এই মূর্ত্তি-পূজা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা তাঁহাদের জীবনের আনন্দ ও যথাসর্ব্বস্ব। হিন্দু মুনি ঋষিগণ এই মূর্ত্তিপূজার ফল। তাঁহারা প্রথমে ভক্তিপূর্ব্বক স্থূল সাকার উপাসনায় সিদ্ধ হইলে মানস প্রতিমার পূজা করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম সাকার উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া জ্ঞান দ্বারা নিরাকার ব্রহ্ম লাভ করিয়াছিলেন।

গৌণীভক্তি সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইলে মূর্ত্তিপূজায় বিকশিত হয়। ভক্তি যখন চরম সীমায় আইসে, তখন তাহা সগুণ ভগবানকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ দেখে। সেই প্রত্যক্ষের ফল ভগবানের শক্তি-শরীর ও দেবমূর্ত্তি। যে দেবমূর্ত্তিপূজা ভক্তির পরাকাষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিপূজা আবার ভক্তি-বৃদ্ধির সাধন। যাহা ভক্তি হইতে প্রসূত, তাহাই ভক্তিতে লইয়া যায়। তাহা সেই ভক্তিতে লইয়া যায়, যে ভক্তিতে উপনীত হইলে মানব ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হয়েন এবং ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মফল ও প্রাণ-মন সমর্পণ করেন। হিন্দু যখন এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহার নিস্পৃহতা হয়। নিস্পৃহতা হইলেই নিষ্কামভাব স্বতই সম্ভূত হয়।

নিষ্কামভাব পরাভক্তিতে লইয়া যায়। পরাভক্তিই আত্মরতি,

ম্নরতিই মোক্ষ বা ব্রহ্মপদলাভের পূর্ব্বাবস্থা। আত্মরতির
য় হইলেই জীবের মোক্ষসাধন হয়। যে পরাভক্তি এইরূপ
ক্ষসাধক তাহা কিরূপ? পরাভক্তি চিত্তের প্রবল ঈশ্বরানুরাগ।
গুিল্য বলিয়াছেনঃ—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য পরাভক্তিকে গৌণীভক্তি হইতে প্রভিন্ন
রিয়া দিলেন। * তাঁহার মতে পরাভক্তিই ভক্তি নামের
াগ্য। গৌণীভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধা নাম দিয়াছেন। কিন্তু
চরাচর শ্রদ্ধাও ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এ জন্য আমরাও
নেক স্থলে এই গ্রন্থে সেই অর্থে ভক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।
স যাহা হউক, শাণ্ডিল্য বলেন, ভক্তি কেবল আরাধ্য ঈশ্বরে
প্রবল অনুরাগ। তাহা ইচ্ছা করিলেই সমুৎপন্ন হয় না।

---

* এই সূত্রে একদা গৌণী ও পরাভক্তি ভেদে দ্বিবিধ ভক্তির লক্ষণ প্রদত্ত
ইয়াছে। গৌণীভক্তি কি? সা—পরানুরক্তিরীশ্বরে; তাহা ঈশ্বরে পরানুরক্তি।
্রাভক্তি কি? সাপরা,—অনুরক্তিরীশ্বরে। পরাভক্তি ঈশ্বরে অনুরক্তি। এই
ূত্রের এই দ্বিবিধ পাঠই সুসঙ্গত বলিয়া তাহা একদা দ্বিবিধ ভক্তিরই লক্ষণ
রূপে সূত্রিত হইয়াছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের পর যে ঈশ্বরে রতি হয়, তাহাই
গৌণীভক্তি এবং পরম জ্ঞানোদয়ে যে আত্মরতি জন্মে, তাহাই পরাভক্তি।
স্বপ্নেশ্বর বলেন, এই পরাভক্তির লক্ষণই শাণ্ডিল্যানুমত এবং পরাভক্তির
লক্ষণ করাতেই তাহাকে গৌণীভক্তি হইতে প্রভিন্ন করা হইয়াছে।

স্বপ্নেশ্বর বলেন, এস্থলে "অনুরক্তি" শব্দের বিশেষ অর্থ আছে। অনু-
শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। আরাধ্য ঈশ্বরে রাগ বা প্রগাঢ় প্রীতি কেবল আরাধ্য
বিষয়ক জ্ঞানের পরেই জন্মে। অগ্রে জ্ঞান, তৎপরে যে প্রগাঢ় রাগ জন্মে, তাহাই
ভক্তি। জ্ঞান দ্বিবিধ—সামান্য ও পরম জ্ঞান। সামান্য জ্ঞানের পর যে রাগ
তাহাই গৌণীভক্তি বা শ্রদ্ধা, পরম জ্ঞানের পর যে রতি তাহাই পরাভক্তি বা
আত্মরতি।

ঈশ্বরে দৃঢ়ানুরক্তি অনেক সাধনার ফল। গীতা বলেন, অনেকে অনেক সাধনা করিয়াও সফল হয়েন না। যাহা এত সাধনার ফল, তাহা কি শুদ্ধ মুখের কথা? না, শ্রবণ করিলেই তাহা হৃদয়ে উদয় হইবে? চিরদিন, প্রতিদিন সাধনা কর, তবে যদি ঈশ্বর কৃপা করেন। অনুরাগ-বলে ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত প্রবল ভক্তির উদয় হয় না। নারদীয় ভক্তি-সূত্রে আছে :—

"মহাত্মাগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাদৃষ্টি ভক্তির মুখ্য সাধন।"

সেই কৃপাকণা লাভ করিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হয়। সাধুসঙ্গ ও দেবসঙ্গই তাহার প্রধান সাধন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকিতে থাকিতে, দেবসাধনা করিতে করিতে তবে ক্রমে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। ভক্তির সঞ্চার না হইলে নিষ্কাম ধর্ম্ম কখনই সাধ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর-কামনা ব্যতীত অন্ত কামনা যখন মনে স্থান না পায়, তখনই হৃদয়ে নিষ্কামভাবের সঞ্চার হইতে পারে। শুদ্ধ ঈশ্বর-কামনায় জীবনোৎসর্গ তখন ঘটে, যখন মন হইতে অন্যান্য কামনা তিরোহিত হয়। সামান্য ঈশ্বরানুরাগে মনের এ অবস্থা সম্ভাবিত নহে। সেই অনুরাগ প্রবল করিতে হইলে যাহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস ঘটে এরূপ সাধনা করা চাই। মায়াময় সংসারধর্ম্মে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটা বড় সহজ কথা নহে। ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে না; কিন্তু যখন কর্ম্ম আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে। ইচ্ছা করিয়া সংসারবিরাগী হইলে কি মনের বাসনার অবসান হয়? হৃদয়ভরা বাসনা অতৃপ্ত থাকিলে কি কেহ বিরাগী হইতে পারে? এ জন্য প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা-প্রণালীতে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যে সংযমী হইয়া জ্ঞানানুশীলন করিতে হইত। তৎপরে সংসারাশ্রমে হৃদয়ের

সমস্ত প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন করিতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে বরাবর সংযম-নিয়ম অভ্যাস করা চাই। তবেই, হৃদয় ও মনের পূর্ণানুশীলন না হইলে হিন্দুমতে মানবের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সংযমী হইয়া সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্তির তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে তবে কামনা ত্যাগ করিতে পারা যায়। কামনা পরিত্যাগ করা বহু অভ্যাসের ফল। অভ্যাস করিতে করিতে তবে লোক ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম-ফল সমর্পণ করিতে পারে। মনের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহার কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে। কর্ম্ম-সন্ন্যাসীই যথার্থ বৈরাগী। কর্ম্ম-সন্নাস ঘটিলে সংসারধর্ম্মে স্বতই বিরাগ জন্মে। সংসার-ধর্ম্মে বিরাগ জন্মিলে সে ধর্ম্ম সুচারুরূপে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই সে ধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ম অগ্রে সংসারীকে প্রবৃত্তিপথের পথিক হইয়া থাকিতে হয়। এই প্রবৃত্তি-পথের পথিক হইয়া সকামভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে করিতে যখন সংসারীর বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশঃ ভক্তির পরিণতি ঘটে, তখন তিনি নিজেই সংসার বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়েন। ঈশ্বরানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের সংসার-বিরাগ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি-পথের অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে সংসারীর যখন প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, তখন তাহার কলি-ভোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের প্রায় শেষ, বার্দ্ধক্যের উপক্রম। সে সময়ে সংসার-বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হওয়াই উচিত। বার্দ্ধক্যেও যিনি ঈশ্বরানুরাগী না হন, তাঁহার ধর্ম্মনুষ্ঠান সকল বিফল হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যিনি ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারেন, তাঁহারই ধর্ম্মানুষ্ঠান যথার্থ ফলপ্রদ হইয়াছে। নিতান্ত পক্ষে

বার্দ্ধক্যে একান্ত ঈশ্বরানুরাগী হওয়া চাই। তজ্জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির নিয়ম। এই নিয়মাদি সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইলে ভক্তিসঞ্চারেরই কথা। কোন কোন স্থলে তাহা ঘটিয়াও থাকে। যে স্থলে তাহা না ঘটে, সে স্থলে পৌরাণিক জ্ঞান যথারীতি অর্জ্জিত হয় নাই এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয় নাই। যথারীতি সুসম্পন্ন হইবার জন্য তাহাতে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা চাই। যাহাতে এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা জন্মে,—অগ্রে তাহার শিক্ষা ও তন্নিবন্ধের প্রয়োজন।

এই সমস্ত সোপান ধরিয়া গেলে তবে ক্রমে ঈশ্বরানুরাগ সঞ্জাত হইতে পারে। সংসার-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগ যাহাতে জন্মিতে পারে, এইরূপ পন্থা হিন্দুধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়াছে। গৃহীর যত দিনে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিবে, তত দিনে তাহার পুত্র পৌত্রাদি মানুষ হইয়া সংসারী হইয়া আসিবে। * তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্রে পুত্র-কামনা। পুত্রগণ গৃহীকে সংসার-বন্ধনরূপ পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করেন। পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গৃহী ঈশ্বরানুরাগের পরিণতি সাধন করেন। গৃহী তখন বানপ্রস্থ। নিষ্কামী হইয়া গৃহী তখন সংসার হইতে অপসৃত হয়েন। সুতরাং বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, সকামের পরিণতি না হইলে নিষ্কাম ভাবে আসা যায় না। আশ্রম-ধর্ম্মের ও ভক্তিমার্গের কল্পনা এই। এখন আর চারি আশ্রম-নিয়ম নাই বটে, কিন্তু এক সংসারাশ্রমেই সকল নিয়ম পালন করা যাইতে পারে।

---

* সাধারণ সমাজের জন্য এই নিয়ম। দুই চারি জন এই নিয়মাতিরিক্ত হইলে তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। তাহারা নিয়মের নিপাতন। সকল নিয়মেরই নিপাতন আছে। সাধারণের জন্যই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

সকাম-ধর্ম্ম।

এই সকাম ধর্ম্মে হিন্দু পরিপুষ্ট হইলে তবে তিনি নিষ্কামী হইতে পারিবেন। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সকাম, দেবত্বের জন্য হিন্দু সকাম। হিন্দুর ধনকামনা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি সমস্ত কামনাই ধর্ম্মের জন্য। এই সকাম পথে হিন্দুকে পরিচালন করিতে পারিলে তাঁহার ভক্তির উদয় হয়। এই সকাম, হিন্দুর সকাম; আমরা অন্য সকামের কথা বলি নাই। এই সকাম ধর্ম্মে হিন্দুকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। সুতরাং সকাম ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি-পাঠ, পৌরাণিক চরিত-কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ এবং অপরাপর আলোচনা ও সাধনা দ্বারা হিন্দুসংসারীকে ভক্তি পথে উঠিতে হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ হৃদয়-মধ্যে জাজ্বল্যমান থাকা চাই। এই আদর্শ ধরিয়া গৃহী একে একে ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিবেন। এই অভ্যাস-যোগ ব্যতীত নিষ্কাম পথে আসা যায় না। প্রবৃত্তিকে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে নিবৃত্তিমুখী করাই অভ্যাস-যোগ। এই অভ্যাস ধর্ম্মানুরাগসাপেক্ষ। ধর্ম্মানুরাগ শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ। শ্রদ্ধা ভজনা-সাপেক্ষ। এ সমস্তই গৌণীভক্তিমূলক উপাসনা। পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে এ উপাসনা আরব্ধ হয় না। পাপাসক্তি পরিত্যাগের উপায় প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মসংযম। আত্মসংযমী না হইতে পারিলে পুণ্যপথে আসা যায় না। এই সোপান ধরিয়া অভ্যাস করিয়া গেলে তবে ভক্তি-যোগে সিদ্ধ হওয়া যায়। মহাভারত বলিয়াছেন, রজ ও তমোগুণ-নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। এই যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিলে সাত্ত্বিকী ভক্তিতে উপনীত

হওয়া যায়। এই যোগদ্বারা প্রথমে গৌণীভক্তির উৎপত্তি হয়; গৌণীভক্তি পরাভক্তিতে ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়। পরাভক্তিতে উপনীত হইতে পারিলে তবে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হওয়া যায়। এই ভক্তিযোগ-পথে অগ্রসর হইলে তবে নিষ্কাম পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই নিষ্কামের প্রথম সোপান সকাম প্রবৃত্তি পথে। প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মকামনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই সকাম ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়পরায়ণা প্রবৃত্তি স্বভাবতই অনিত্য সুখের অভিলাষিণী। সেই অনিত্য সুখের অভিলাষকে ফিরাইয়া ধর্ম্মের নিত্য সুখের দিকে আনা চাই। বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর যে প্রগাঢ় অনুরাগ, সেই অনুরাগকে ফিরাইয়া প্রথমে পারত্রিক সুখের দিকে আনা চাই। ঈশ্বরের প্রতি তদ্রূপ অনুরাগকেই ভক্তি বলে। বিষয়ীর সেই সহজ অনুরাগকে অনিত্য সুখ হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বরের প্রতি আনিতে পারিলে ভক্তি জন্মে। তজ্জন্য প্রবৃত্তিকে পারত্রিক সুখানুগামিনী করাই প্রথম কার্য্য। এই কার্য্য হইতে ধর্ম্ম-পথ আরব্ধ হয়। ঐহিক হইতে পারত্রিক পথে আসিলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম আরব্ধ হয়।

গীতোক্ত ধর্ম্ম-সাধনা।

আমরা গীতানুসারেই এই সাধন-পথ বিবৃত করিয়াছি। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্তির সহিত গৌণী ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কারণ, গৌণী ভক্তির সহিত পরম ভক্তি অতি ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ। গৌণী ভক্তির পথ ধরিয়া গেলে তবে পরম ভক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। গৌণী ভক্তির সহকারিতা না থাকিলে পরম ভক্তি প্রস্ফুটিতে পারে না। গৌণী ভক্তির শিরে

রম ভক্তি আছে বলিয়া গৌণী ভক্তির এত গৌরব। উভয়ে এইরূপ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন মুখই দেহের গৌরবস্থল, মুখ না থাকিলে দেহীকে চেনা যায় না, দেহের গৌরব হয় না, সেইরূপ পরম ভক্তি শেষে আছে বলিয়া গৌণী ভক্তির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যেমন দেহের স্ফূর্ত্তি না হইলে আস্য দেশের স্ফূর্ত্তি হয় না, দেহ নহিলে মুখ তিষ্ঠিতেই পারে না, তেমনি গৌণী ভক্তির অবলম্বন না থাকিলে পরম-ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া ভগবদ্গীতা তদুভয়কে এক সঙ্গে সূত্রিত করিয়া বলিতেছেন :—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"
গীতা। ৭—১৬।

"হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই সুকৃতি-বশতঃ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।"

এই চতুর্ব্বিধ ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানীই মুখ্য, অন্য ত্রিবিধ গৌণ। শাণ্ডিল্যের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, যেমন রাজ-সমভিব্যাহারে সৈন্য থাকিলে, সৈন্যগণের গৌরব হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীর সাহচর্য্য বশতঃ ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্য হইয়াছে। আবার এ কথাও সত্য যে, যেমন সৈন্যবল ব্যতীত রাজা তিষ্ঠিতে পারেন না, তেমনি ঐ ত্রিবিধ ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত মুখ্য ভক্তি সঞ্জাত হইতে পারে না। মুখ্যভক্তি সঞ্জাত হয় কিরূপে, গীতা তাহার উপদেশ দিতেছেন :-

"কামনাতে যাহাদিগের বিবেক আচ্ছাদিত আছে, তাহারা বাসনার বশীভূত হইয়া দেবতাভেদে নিয়মাবলম্বনে উপাসনা

করিয়া থাকে। ঐ সকল দেবোপাসক মধ্যে যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার যে যে মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া সেই মূর্ত্তির উপাসনা-বিষয়িণী অচলা শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি। পরে এই দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া সেই ভক্ত আমার আরাধনা করিয়া সেই মূর্ত্তির প্রসাদাৎ সংকল্পিত ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমিই সেই মূর্ত্তির অন্তর্যামিত্বরূপে আসিয়া সেই ফল প্রদান করি। ঐ সকল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের উপাসনা জন্য ফল অনিত্য, কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহারা নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।"

গীতা। ৭ অ, ২০-২৩।

তবেই দাঁড়াইতেছে, অর্থার্থীও দ্বিবিধ। একবিধ অর্থার্থী স্বর্গাদি অথবা ঐশ্বর্য্য-সুখাভিলাষী। সেই সুখ অনিত্য। অন্যবিধ অর্থার্থী নিত্য সুখরূপ ভূমানন্দের অভিলাষী। এই দ্বিবিধ অর্থার্থীই ঈশ্বরের ভজনা করেন। ঈশ্বরের ভজনা কি উপায়ে সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবদ্গীতা উপদেশ দিতেছেন :—

বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবোজ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

গীঃ ৪ অ, ১০-১১।

'তাঁহাদের বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ সমস্তই অপগত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিষয়ানুরাগ ভয় ও ক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাদের চিত্ত-স্থৈর্য্য জন্মে, তখন তাঁহারা জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া মদ্ভাবপরায়ণ হন। সকাম

এবং নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে ব্যক্তি আমার সাধনা করে, আমি তাহাকে তদ্দ্বারা ফল প্রদান করি। সকলেরই প্রতি আমার অনুগ্রহ। যাহারা দেবতাদের উপাসনা করে তাহারা প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করে।”

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ

এই উপাসনা কিরূপে সিদ্ধ হয়? গীতা বলিতেছেন, জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা। জ্ঞান ও তপস্যা না হইলে সংশয় ও পাপ-মালিন্য যায় না। সেই সংশয় ও মালিন্য দূরীকৃত হইলে তবে পবিত্রতা জন্মে। পবিত্রতা না জন্মিলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। তপস্যা কি? না, সমুদয় ইন্দ্রিয়াসক্তি ও মনের আবেগ-বশীকরণ। মহাভারত বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম ইহাই মানসিক তপস্যা। তপস্যা-বলে চিত্তস্থির হইলে জীব একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহারই প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভের উপায়-স্বরূপ তপস্যায় সিদ্ধ হইলে তবে জীব ঈশ্বর-লাভের ধ্রুবপথে আসিলেন। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, এজন্য তপস্যাই সিদ্ধি-লাভের ধ্রুব পন্থা। পবিত্র চিত্তে সেই ধ্রুব পথে অগ্রসর হইলে তবে তিনি ভূমানন্দরূপ “প্রহ্লাদত্ব” অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। সকাম ধ্রুবের তপস্যা সেই তপস্যা। আর, প্রহ্লাদের ভক্তিতে যে ভূমানন্দ ছিল, সেই ভূমানন্দে প্রমত্ত প্রহ্লাদ সংসারের সর্ব্বভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুব ধনঞ্জয়, প্রহ্লাদ কৃষ্ণময়। ধ্রুব প্রহ্লাদ এক হইলেই মুক্তিলাভ সুনিশ্চয়।

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ধ্রুব-প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তে আমরা ভক্তিপথের সকলই সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাই। ধ্রুবই প্রহ্লাদত্বে উঠিবার ধ্রুবপথ। সংযমীর সেই ধ্রুবপথই তপস্যা। সকাম ভক্তি যাঁহাদের নিকট আদরণীয়া নহে, যাঁহারা নিষ্কাম ভক্তির একান্ত প্রয়াসী, তাঁহারা ভাবিয়া খুন হন, কিরূপে তাঁহাদের একেবারে নিষ্কাম ভক্তির সঞ্চার হইবে। আমরা বলি, নিষ্কাম ভক্তি সহসা উদয় হইতে পারে না। অগ্রে গৌণী ভক্তির সাধনা কর, তবে নিষ্কাম ভক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। সেই গৌণী ভক্তির সাধনাপথ জ্ঞান ও তপস্যা। জ্ঞান ও তপস্যার সাধন-পথে সিদ্ধ হইলেই তুমি গীতোক্ত জ্ঞানী হইবে এবং নিষ্কাম ভক্তি তোমার করতলস্থ হইবে। ঈশ্বরকে যিনি মনোহর শিবশম্ভু বা শ্যামসুন্দর-রূপে সর্ব্বদা মনোমন্দিরে স্থাপিত দেখিতে পান, তিনিই তাঁহাকে অনুক্ষণ পূজা করিতেছেন, তাঁহারই জ্ঞান-স্পৃহা সার্থক হইয়াছে, তাঁহারই তপস্যা সফলতা লাভ করিয়াছে। সেই সংযমী ধর্ম্ম-বীরই এই সংসারের কুরুক্ষেত্রে সমস্ত রিপুদলের উপর বিজয়লাভ করিয়া তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনিই নিষ্কামী হইয়া সেই হরিহর-পদে সমস্তই সমর্পণ করিতে পারেন। সার্থক তাঁহার জীবন, সার্থক তাঁহার তপস্যা, সার্থক তাঁহার ভক্তি! তিনিই সর্ব্বদা ঈশ্বর-সহবাস-সম্ভোগের ভূমানন্দে ভোর হইয়া আছেন!

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"
"যথা কৃষ্ণ যোগেশ্বর, যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তথা জয় সুনিশ্চয়, এই নীতি জগন্ময়।"

সম্পূর্ণ।